স্টপার

মতি নন্দী

পরিবেশক :
প্রকাশক ॥ ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়
রায়পুর, বিড়লাপুর,
দক্ষিণ ২৪-পরগণা

মুদ্রক :
সনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিন্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৩
এপ্রিল, ১৯৫৬

॥ এক ॥

"এসে গেছেন! আচ্ছা এক মিনিট, আপনি বরং এখানেই বসুন।"

অনুরোধ নয়, যেন নির্দেশ। তরুণ সাংবাদিক ঢোক গিলে ঘাড় নাড়ল এবং নড়বড়ে লোহার চেয়ারটায় বসে সপ্রতিভ হবার জন্য রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছে, পায়ের উপর পা তুলে প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল, তারপর কী ভেবে সিগারেটটা আবার প্যাকেটে ভরে রাখল।

তার দশ গজ দূরেই ছড়িয়ে রয়েছে হাফপ্যাণ্ট-পরা, কতকগুলো আদুড় দেহ। তারা ঘাসের উপর চিত হয়ে, উপুড় হয়ে বা পা ছড়িয়ে বসে। ঘাম শুকিয়ে এখন ওদের চামড়ার রঙ ঝামা ইটের মত বিবর্ণ, খসখসে। সন্তর্পণে তারা শ্রান্ত হাত পা বা মাথা নাড়ছে। চোখের চাহনি ভাবলেশহীন এবং স্থির।

ওদের একজন গভীর মনোযোগে পায়ের গোছে বরফ ঘষছে; ধুতি-পাঞ্জাবি পরা স্থূলকায় এক মাঝবয়সী লোক তার সামনে উবু হয়ে দু'বার কি বলল, মাথা নিচু করে ছেলেটি বরফ ঘষেই যাচ্ছে, জবাব দিল না।

উপুড় হয়ে দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে এতক্ষণ শুয়েছিল যে ছেলেটি, সে হঠাৎ উঠে বসে কর্কশস্বরে চীৎকার করল, "কেষ্ট, কতক্ষণ বলেছি জল দিয়ে যেতে।"

তাঁবুর পিছন দিক থেকে একটা চাপা গজগজানি এর

জবাবে ভেসে এল।

তরুণ সাংবাদিক তাঁবুর ভিতরে তাকাল। তাঁবুর মাঝখানে সিমেন্টের একফালি চত্বর। পাতলা কাঠের পাল্লা দেওয়া স্প্রিং-এর দরজা দু'ধারে। দরজাগুলো ঝাপট দিচ্ছে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনায়, চত্বরটার পিছনটা খোলা। সেখান দিয়ে পাশের তাঁবু এবং একটা টিউবওয়েল দেখা যাচ্ছে। একটা গোল স্টিলের টেবিল চত্বরের মাঝখানে, সেটা ঘিরে সাত-আটজন লোক বসে এবং গলা চড়িয়ে তারা তর্ক করছে। কয়েকটা চায়ের কাপ টেবিলে। একজন চোখ বুঁজে টোস্ট চিবোচ্ছে। পাখা ঘুরছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় তাঁবুর ভিতরটায় ভ্যাপসা গুমোট।

"আপনার চা।"

সাংবাদিক চমকে তাকাল। গেঞ্জি-পরা একটা ছেলে, হাতে ময়লা কাপ। ছুটি বিস্কুট কোনক্রমে কাপের কিনারে পিরিচে জায়গা করে রয়েছে।

"আমার! আমি তো—"

"কমলবাবু পাঠিয়ে দিলেন।"

সাংবাদিক হাত বাড়িয়ে পিরিচটা ধরল, আর চা খেতে খেতে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে লাগল গত দু'দিন ধরে তৈরী করে রাখা প্রশ্নগুলো।

"তোকে পইপই বললাম, ডানদিকটা চেপে থাক, তবু ভেতরে চলে আসছিলিস।"

"আমি কি করব, শম্ভুটা বার বার বলছে—রাখতে পাচ্ছি না, রাখতে পাচ্ছি না, বলাই একটু এধারে এসে আগলা। সাইড আর মিডল দুটো ম্যানেজ করব কি করে?"

"সলিলটা যদি চোট না পেত! ভালই খেলছিল।

সুকল্যাণের ওই শট গোললাইনে বুক দিয়ে আটকানো, বাপ্ স। আমি তো ভাবলাম বুকটা ফেটে গেল বুঝি।"

"সলিলের লেগেছে কেমন?"

"কে জানে, কমলদা তো ভেতরে নিয়ে গিয়ে কি-সব ওষুধ-টষুধ দিচ্ছে।"

"পুষ্যিপুত্তুর কিনা, তাই ওর বেলা ওষুধ আর আমাদের বেলা বরফ ঘষো।"

"ট্যালেন্ট। ওর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে আর আমাদের মধ্যে গোবর। যাক্‌গে, ছোটমুখে বড় কথা বলে লাভ নেই; বলাই, মনে থাকে যেন কাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বসুশ্রীর গেটে।"

"এখনো তোর কাছে চার আনা পাই।"

"কিসের চার আনা?"

"ভুলে মেরে দিচ্ছ বাবা, 'দিলকো দেখো'-র টিকিট কাটার সময় ধার নিয়েছিলি না?"

"উঃ, কবেকার কথা ঠিক মনে রেখে দিয়েছিস তো। চার আনা আবার পয়সা নাকি!"

সাংবাদিক কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। ডিগডিগে লম্বা যে ছেলেটি এতক্ষণ চিত হয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে শুয়েছিল, অস্ফুট একটা শব্দ করে হাত নামিয়ে তাকাতেই সাংবাদিকের সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

"রেজাল্ট কি?" সাংবাদিক চাপা গলায় জানতে চাইল।

"পাঁচ।"

সাংবাদিক সমবেদনা জানাতে চোখমুখে যথাসম্ভব দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল। ছেলেটি শুকনো হেসে বলল, "ডজন দিতে পারত, দেয়নি।"

"সিজনের প্রথম খেলা এটা ?"

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে উঠে বসল। ঢোক গিলল, শুকনো ঠোঁট চাটল, জিরজিরে বুক। কাঁধে উঁচু হয়ে রয়েছে হাড়। কোমর থেকে পাতা পর্যন্ত পা দুটো সমান। পেশীর ওঠানামা কোথাও ঘটেনি। সাংবাদিকের মনে হলো ছেলেটিকে গোল পোস্টের মাঝখানে ছাড়া মাঠের আর কোথাও ভাবা যায় না।

"সরি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। চা দিয়ে গেছে তো ?"

একটা চেয়ার টানতে টানতে কমল গুহ সাংবাদিকের পাশে এনে রাখল।

"আর এক কাপ হোক।"

"না না, আমি বেশি চা খাই না।"

"ভাল। বেশি চা খেলে স্বাস্থ্য থাকে না। গত পঁচিশ বছরে আমি ক'কাপ চা খেয়েছি বলে দিতে পারি। ফুট-বলারের সব থেকে আগে দেখা উচিত নিজের শরীরটাকে। নয়তো বেশিদিন খেলা সম্ভব নয়। ফার্স্ট ডিভিশনেই কুড়ি বছর, হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি বছরই খেলছি।"

সাংবাদিক ইতিমধ্যে তার নোটবই খুলে বল-পেনের আঁচড়ে দু'চার কথা লিখে ফেলেছে।

"আপনার বয়স কত এখন ?"

"আপনিই বলুন।"

"কুড়ি বছর যদি ফার্স্ট ডিভিশনে হয় তাহলে অন্তত চল্লিশ।"

কমলের চোখে আশাভঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল। "আপনি আমার কেরিয়ার থেকে হিসেব করে বললেন। কিন্তু

আমায় দেখে বলুন তো বয়স কত ?"

ভ্রূ কুঁচকে সাংবাদিক বোর্ডে দুরূহ কোনো অঙ্কের দিকে তাকানো মেধাবী ছাত্রের মত ওর দিকে তাকাল। চুলগুলো কোঁকড়া, মোটা, ছোট করে ছাঁটা। দু'কানের উপরে অনেক চুল পাকা। কপালে রেখা পড়েছে তিন-চারটি। সাংবাদিকের মনে পড়ল, একটা বইয়ে পাতাজোড়া স্ট্যানলি ম্যাথুজের মুখের ছবি সে দেখেছিল। তলায় লেখা—'দি ফেস অফ থারটিফাইভ ইয়ারস্ অফ টেনশন ইন ফুটবল।' ম্যাথুজের কপালে পাঁচটি রেখা; ঠোঁটের কোলে একটি, তার পরেই আর একটু বড় আকারের, টানাপোড়েনে থরথর দুটি ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছে। এরপর চোখের কোণ পর্যন্ত সারা গাল বেলাভূমির মত কুঞ্চিত। কিন্তু কমল গুহর চোখ ম্যাথুজের মতন বিশ্রামপ্রত্যাশী অবসন্ন নয়। পাথরের মত ঝকঝকে, কোটরের মধ্যে বসানো। অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ এবং চ্যালেঞ্জ জানায়।

সাংবাদিক নোটবইটা কাত করে, কমল গুহর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়ই পাতার কোণায় চট্ করে লিখল—রাগী, ভোঁতা, সেন্টিমেন্টাল।

বেশি দুধ দেওয়া চায়ের মতন গায়ের রঙ কিংবা মেদহীন মধ্যমাকৃতি এই বাঙালী ফুটবলারের চেহারার মধ্যে সাংবাদিক কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল না। গলার স্বর ঈষৎ ভারী ও কর্কশ। শুধু চোখে পড়ে হাঁটার সময় দেহটি বাহিত হয় শহীদ মিনারের মত খাড়া মেরুদণ্ড দ্বারা। হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততা নেই।

"আটাশ বড়জোর তিরিশ।" সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল।

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কমল গুহ। সাংবাদিকের অস্বস্তি দেখে হাসিটা আরো বেড়ে গেল। তাঁবুর সামনে দিয়ে ছুটো ঘোড়সওয়ার পুলিস ডিউটি সেরে ফিরছিল। তারা বাধ্য হলো ঘোড়ার রাশ টেনে ফিরে তাকাতে।

"বড্ড কমালেন কিন্তু। আমার অফিসের বয়স কমানো আছে বটে, কিন্তু এতটা কমাতে সাহস হয়নি। কিছু মনে করবেন না, আপনার বয়স কত?"

সাংবাদিক গলা খাঁকারি দিয়ে খুব গম্ভীর হতে হতে বলল, "পঁচিশ।"

কমল গুহ ভুরু নাচিয়ে বলল, "আসুন মাঠটা দশ পাক দৌড়ে আসি।"

"তা কি করে সম্ভব!" সাংবাদিক প্রতিবাদ করল। "একজন ফুটবলারের সঙ্গে আমি পারব কেন। আপনাকে যদি বলি একপাতা লিখতে, পারবেন কি আমার মতন?"

কমল গুহর মুখ থেকে মজার ভাবটা আস্তে আস্তে উবে গেল।

"ঠিক। বলেছেন ঠিকই। আমি পারব না একপাতা লিখতে। কিন্তু আপনি আমার বয়স জানতে চাইলেন কেন? আমার শরীরের ক্ষমতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার জন্যই তো? যদি বলি পঁচিশ তাহলে ভেবে নেবেন, অন্তত ১১ সেকেণ্ডে আমি ১০০ মিটার দৌড়তে পারি। যদি বলি চল্লিশ তাহলে সেটা ১৫ সেকেণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমরা দুজনে দৌড়োই এবং আপনাকে হারিয়ে দিই, তাহলে কি আমার বয়স পঁচিশ বছর বলে আপনি মেনে নেবেন না? সন তারিখ দিয়ে কি বয়স ঠিক করা যায়, শরীরের ক্ষমতাই



আসুন, মাঠটা দশ পাক দৌড়ে আসি।

হচ্ছে বয়স। বুঝলেন, এখন আমার বয়স সাতাশ।"

সাংবাদিক টুক্ করে তার নোটবইয়ে 'হামবাগ' কথাটা লিখে প্রশ্ন করল, "আপনার লাস্ট ম্যাচ কোনটা যেটা খেলে রিটায়ার করেন?"

"রিটায়ার, আমি? লাস্ট ইয়ারেও দুটো ম্যাচ খেলেছি হাফ-টাইমের পর। দরকার হলে এ বছরও খেলব। সলিলটা আজ হাঁটুতে চোট পেয়েছে, সারতে মাসখানেক লাগবে। হয়তো আমাকে নামতে হতে পারে। স্টপারে খেলা, ছোট একটা জায়গা নিয়ে, খুব একটা অসুবিধে হয় না।"

"স্ট্যানলি ম্যাথুজ তো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলে গেছেন। ইংল্যাণ্ডের হয়েই তো খেলেছেন তেইশ বছর।"

"মহাপুরুষ ওরা। তাও উইং ফরোয়ার্ডে। অত বয়সে ওই পজিশনে খেলা ভাবতে পারি না। আমি প্রথম যখন ফার্স্ট ডিভিশনে শুরু করি, রাইট ইনে খেলতাম।"

"কোন ক্লাবে?"

"এখানে শোভাবাজার স্পোরটিংয়েই প্রথম দু'বছর, তারপর ভবানীপুর, দু'বছর পর এরিয়ানে, সেখানে এক বছর কাটিয়ে যুগের যাত্রীতে চার বছর, মোহনবাগানে এক বছর, আবার যুগের যাত্রীতে দু'বছর, তারপর আবার শোভাবাজারে। টু ব্যাক সিস্টেমে খেলা শুরু করে, থ্রি ব্যাক পার করে ফোর ব্যাকে পৌঁছে গেছি। রাইট ইন থেকে পল্টুদা আমাকে স্টপারে আনেন।"

"কে পল্টুদা?" সাংবাদিক বল-পেন উঁচিয়ে প্রশ্ন করল।

"চিনবেন না আপনি। পল্টু মুখার্জি, আমার গুরু। থারটিফাইভে উনি খেলা ছেড়েছেন। দুখিরাম বাবুর হাতে

তৈরী, খেলতেনও এরিয়ানে। ওর আড্ডা ছিল এই শোভাবাজার টেণ্টে তাস খেলায়। জুয়া, রেস, নেশাভাঙ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু তৈরী করেছেন অনেক ফুটবলার। ফুটবলের যতটুকু শিখেছি বা যতটুকু খ্যাতি পেয়েছি সবই ওর জন্য। গুরুর ঋণ আমি কোনদিনই শুধতে পারব না। বলতে গেলে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। কতদিন ওর বাড়িতেই খেয়েছি, থেকেছি। উনিই আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছেন।"

কমল গুহ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জামা খুলতে শুরু করল। সাংবাদিক অবাক হয়ে থাকার মধ্যেই চট করে নোটবইয়ে লিখে ফেলল, 'গুরুবাদী।'

জামাটা গলা পর্যন্ত তুলে কমল গুহ পিছন ফিরে বলল, "দেখছেন ঘাড়ের নীচে শিরদাঁড়ার কাছে?"

একটা বহু পুরনো, প্রায় দু'ইঞ্চি দাগ দেখতে পেল সাংবাদিক। "হ্যাঁ, বুটের দাগ।"

"বুটের নয়, কাঁসার বগিথালা দিয়ে পিটিয়েছিলেন।"

"থালা দিয়ে!"

কথাটা কে বলল দেখার জন্য সাংবাদিক পিছন ফিরে তাকাতেই তার শরীর সিরসিরিয়ে উঠল। একটা বনমানুষ যেন জামা-প্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়ে। নিকষ কালো রঙ, ভুরুর এক ইঞ্চি উপর থেকে শুরু মাথার চুল, চোখ দুটো কুতকুতে গর্তে ঢোকানো। নীচের ঠোঁট এত পুরু যে ঝুলে পড়েছে।

কমল গুহ সামনে ফিরে, দু'হাতে মাথার চুলগুলোকে দু'ধারে টেনে বলল, "এখানে আছে একটা। খড়ম পরতেন তারই প্রমাণ রেখে দিয়েছেন।"

"এইভাবে মার খেয়েছেন, কই, কখনো তো বলেননি!"

ছেলেটির মুখ দেখে বোঝা যায় না তার মনে ভয় বা শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের জমি প্রায় সমান। যেন ভূমিষ্ঠ হবার সময়ই মুখে প্রচণ্ড থাবড়া খেয়েছে। কণ্ঠস্বর ওর মনের ভাব প্রকাশ করে।

"খেলা শেখার মাশুস ; দস্তুরমত মার খেয়ে শিখেছি। থালাটা পিঠে পড়েছিল আমাকে সিনেমা হল থেকে বেরোতে দেখে, খড়মটা মাথায় পড়ে টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে।" বলতে বলতে কমল গুহর গলার স্বর ভারী হয়ে এল। চিকচিক করে উঠল চোখের শাদা অংশ। "গুরু হতে গেলে যা হতে হয়, তাই ছিলেন। এখন এভাবে খেলা শেখার কথা ভাবাই যায় না। শট মারতেও শিখল না, বলে—কত টাকা দেবেন ? যদি বলো ট্রেনিংয়ে আসনি কেন, অমনি চোখ রাঙিয়ে বলবে, আমি কি ক্লাবের চাকর ? ওই জন্য কিছু আর বলি না। পচা পচা, সব পচা। যে হতে চায় তাকে তাগিদ দিতে হয় না।"

কমল গুহ কথাগুলো বলল ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নামিয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে।

"আজই ডাক্তারের কাছে যাবি। হাঁটু খুব বিশ্রি ব্যাপার, কোনরকম গাফিলতি করবি না। বহু ভাল ফুটবলারকে শেষ করে দিয়েছে এই হাঁটু। ট্যাক্সিতে যা, টাকা আছে তো ?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল।

কমল গুহ সন্দিহান হয়ে বলল, "কই, টাকা দেখি ?"

"ঠিক চলে যাবোখন।" ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে বলল। কমল গুহ পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরল।

"না না, বাসেই চলে যেতে পারব।"

"যা বলছি তাই কর্।"

ছেলেটিই শুধু নয়, সাংবাদিকও সেই গম্ভীর আদেশ শুনে কুঁকড়ে গেল। নোটটা নিয়ে ছেলেটি কমল গুহকে প্রণাম করল। কমল গুহ আলতো হাত রাখল পিঠে, তারপর ও চলে গেল বাঁ পা টেনে টেনে।

"ছেলেটা সিরিয়াস। গুড মেটিরিয়াল। পড়াশুনা হয়নি, বুদ্ধি কম কিন্তু খাঁটি সোলজার। যা হুকুম হবে তাই পালন করবে। প্রাণ দিতে বললে দেবে। এমন প্লেয়ারও দরকার হয়। দেখি কতখানি তৈরী করা যায়।" কমল গুহর স্বর এই প্রথম কোমল শোনা গেল।

"আপনি কি ওর কোচ?" সাংবাদিক বল-পেন বাগিয়ে ধরল।

"কোচ? ওহ্ না, ক্লাবে এন-আই-এস থেকে পাস করা কোচ একজন আছে। তবে সলিলকে আমি নিজের হাতে গড়ছি। বস্তিতে থাকে, ন'টা ভাইবোন, যতটুকু পারি সাহায্য করি। বেঁচে থাকার লোভ তো সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু একটা সময় আসে যখন মানুষকে মরতেই হয়। তখন সে বেঁচে থাকে বংশধরের মধ্য দিয়ে। ফুটবলারকেও একসময় মাঠ ছাড়তে হয়। কিন্তু সে বাঁচতে পারে ফুটবলার তৈরী করে। সলিলই আমার বংশধর।"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

কমল গুহর মুখের উপর দিয়ে ক্ষণেকের জন্য বেদনা ও হতাশার মেঘ ভেসে চলে গেল। "একটি মাত্র ছেলে। বয়স সতেরো, প্রি-ইউ পড়ে। আমার বিয়ে হয়েছিল খুবই অল্প বয়সে।"

"কোথায় খেলে এখন?"

"কোথাও না। জীবনে কোনদিন ফুটবলে পা দেয়নি। হি হেটস্' ফুটবল। এমনকি খেলা পর্যন্ত দেখে না। আমার খেলাও দেখেনি কখনো। ভাবতে খুব অবাকই লাগে, তাই নয়?"

"আপনার স্ত্রীর ইন্টারেস্ট নেই আপনার খেলা সম্পর্কে?"

কমল গুহ মাথা নাড়ল ক্লান্ত ভঙ্গিতে। "নেই নয়, ছিল না। দশ বছর আগে মারা গেছে, আমার খেলার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনি একদিনও। অমিতাভ তার মা'র কাছ থেকেই ফুটবলকে ঘৃণা করতে শিখেছে। পলিটিক্সের কথা বলে, তাই নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে, গান গায়, কবিতা লেখার চেষ্টা করে কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে একদিনও একটি কথা বলেনি।"

"স্ট্রেঞ্জ!" সাংবাদিক তারপর নোটবইয়ে লিখল, 'স্যাড লাইফ।'

কমল গুহ আনমনা হয়ে স্থির চোখে বহুদূরে এসপ্ল্যানেডের একটা নিওন বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাংবাদিক অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যে-সব ফুটবলার খালি গায়ে শুয়ে-বসে ছিল, তারা স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে এখন পাঁউরুটি আর মাংসের স্টু খাওয়ায় ব্যস্ত। তাঁবুর মধ্য থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে।

"কালিঘাটের খেলার রেজাল্ট কি হলো রে···"

"চলে না দাদা, চলে না, ওসব প্লেয়ার কলকাতা মাঠে সাতদিন খেলবে। বৃষ্টি নামুক, দেখবেন তখন কিরকম মাল ছড়াবে···"

"একশো টাকা হারবো যদি কখনো নিমু হেড করে গোল দেয়···"

"আমাদের নেক্সট ম্যাচ কার সঙ্গে রে···"

"তুই বলটা শ্রীধরকে না দিয়ে গোপালকে চিপ করলি কেন, এয়ারে নায়িমের সঙ্গে কি ও পারে?"···

"আপনার আর কি প্রশ্ন আছে?"

সাংবাদিক ইতস্তত করে বলল, "বহু প্রশ্ন ছিল।"

"যেমন?" কমল গুহ নিরুৎসুক স্বরে জানতে চাইল।

"আপনি ফিফটিসিক্স ওলিম্পিকে যাবেন বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল কিন্তু যেতে পারেননি। কি তার কারণ? আপনি চারবার সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছেন, রাশিয়ান টিমের সঙ্গে ছুটো ম্যাচ খেলেছেন, ইণ্ডিয়ার সেরা স্টপার হিসেবে আপনার নাম ছিল অথচ কত আজেবাজে প্লেয়ার এশিয়ান গেমসে বা মারডেকায় খেলতে গেল আর আপনি একবারও ইণ্ডিয়ার বাইরে যেতে পারেননি, কেন?"

"আর কি প্রশ্ন?"

কমল গুহর নিরুৎসুক স্বর একটুও বদলায়নি। সাংবাদিক তাইতে গম্ভীর হয়ে ওঠা উচিত মনে করল। "কলকাতার মাঠে আপনাদের মত ফুটবলার আর পাওয়া যাচ্ছে না, তার কারণ কি? নব্বুই মিনিটের ফুটবল আমাদের পক্ষে খেলা সম্ভব কিনা? ফুটবল সিজন শীতকালে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে খেলা আরো ভাল হবে কিনা···।"

সাংবাদিক থেমে গেল। তাঁবুর মধ্যে ফোন বাজছিল। একজন চীৎকার করে ডাকল, "কমলদা, আপনার ফোন।"

কমল গুহ চেঁচিয়ে তাকে বলল, "আসছি, এক মিনিট ধরতে বল্।"

তারপর দ্রুত সাংবাদিককে বলল, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেকক্ষন সময় লাগবে, আপনি বরং

আর একদিন আসুন।”

“যদি আপনার বাড়িতে যাই ?”

তাঁবুর দিকে যেতে যেতে কমল গুহ বলল, “তাও পারেন। ছুটির দিনে আসবেন। সকালে।”

সাংবাদিক তার নোটবইটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কিছু একটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করল এবং গভীর বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত অবস্থায় শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে একবার পিছু ফিরে তাকাল। তাঁবুর একটা জানালার মধ্যে দিয়ে কমল গুহকে দেখা যাচ্ছে, ঘাড় নিচু করে ফোনে কথা বলছে।

“অরু ! অরুণা ? কি ব্যাপার, হঠাৎ যে···অ্যাঁ ! পল্টুদা পড়ে গেছেন ? ব্লাডপ্রেশার আবার···ডাক্তার কি বলেন !···দেখানো হয়নি !···হ্যাঁ হ্যাঁ যাচ্ছি, এখুনি রওনা হচ্ছি। টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তুমি ডাক্তার আনো।” ফোন রেখে কমল ঘরের একমাত্র লোক শোভাবাজারের সহ-সম্পাদক অবনী মণ্ডলকে বলল, “কিছু টাকা এখুনি চাই, শ'খানেক অন্তত।”

“এ্যাক—শো ! এখন কোথায় পাব ?”

“যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক এখুনি।”

“চাই বললেই এখন কোথায় পাই, শোভাবাজারের ক্যাশে কত টাকা তা তো আপনাকে বলার দরকার নেই।”

কমল একটা অসহায় রাগে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। অবনী যা বলল তা সত্যি। কিন্তু এখনি টাকাও চাই। এই তাঁবুতে যারা গল্প করছে বা তাস খেলছে তারা কেউ একশো টাকা পকেটে নিয়ে ঘোরে না।

“পল্টুদার স্ট্রোক হয়েছে, এই নিয়ে তিনবার। ওর বড়

মেয়েই ফোন করেছে। কিন্তু কি করে এই মুহূর্তে টাকা পাওয়া যায় বলুন তো? বাড়িতে আছে কিন্তু এখন বাগ-বাজারে গিয়ে আবার নাকতলায় যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।"

"তাইতো, গড়ের মাঠে এই সময় একশো টাকা—" অবনী মণ্ডলের চিন্তিত গলা থেমে গেল। কমল ফোনটা তুলে দ্রুত ডায়াল করছে।

"রথীন মজুমদার আছে? আমি কমল, কমল গুহ শোভা-বাজার টেন্ট থেকে বলছি। খুব দরকার···হ্যাঁ ধরছি।"

মিনিট দুয়েক অধৈর্য প্রতীক্ষার পর ওদিক থেকে সাড়া পেয়ে কমল বলল, "কমল বলছি।" সংক্ষেপে একশো টাকা চাওয়ার কারণটা জানিয়ে বলল, "যদি পারিস তো দে, চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব তোর কাছে। অনেক তো করেছিস আমার জন্যে, এটাও কর। গুরুদক্ষিণা তো জীবনে দেওয়া হলো না, চিকিৎসাটুকুও যদি করতে পারি। কালই অফিসে নিশ্চয়ই টাকাটা দিয়ে দেবো।"

ওধার থেকে জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা করে কমল বলল, "যুগের যাত্রী টেন্টে? এখুনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দশ মিনিটেই পৌঁচচ্ছি।"

কমল রিসিভারটা ছুঁড়েই ক্রেডলের উপর ফেলল। তাঁবু থেকে দ্রুত বেরিয়ে বেড়ার দরজা পার হয়ে ময়দানের অন্ধকারে ঢোকার পর সে প্রায় ছুটতে শুরু করল যুগের যাত্রীর তাঁবুর দিকে।

॥ দুই ॥

গত পনেরো বছরে কমল দু'বার চাকরি, ছয় বার বাসা এবং ছয়বার ক্লাব বদল করেছে। শোভাবাজার স্পোরটিং, ভবানীপুর, এরিয়ান, যুগের যাত্রী, মোহনবাগান, এবং আবার যুগের যাত্রী হয়ে এখন শোভাবাজারে আছে। এই সময়ে সে দর্জিপাড়া, আহিরিটোলা, শ্যামপুকুর, কুমারটুলি, আবার শ্যামপুকুর হয়ে এখন বাগবাজারে বাসা নিয়েছে। ক্লাবের জন্ম শোভাবাজারে এবং নাম শোভাবাজার স্পোরটিং হলেও তার কোনো অস্তিত্ব জন্মস্থানে এখন আর নেই, যেমন কমলের জন্ম ফরিদপুরে হলেও, তিন বছর বয়সে সেখান থেকে চলে আসার পর আর সে দেশের মুখ দেখেনি। শোভাবাজার স্পোরটিং এখন ময়দানের তাঁবুতে আর বেলেঘাটায় কেষ্টদার অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতির বাড়িতেই বিদ্যমান।

কমল যুগের যাত্রীর তাঁবুতে শেষবার পা দিয়েছিল সাত বছর আগে। মোহনবাগান থেকে যাত্রীতে আসার জন্য ট্রান্সফার ফরমে সে সই করে এক হাজার টাকা আগাম নিয়ে। কথা ছিল পাঁচ হাজার টাকা যাত্রী তাকে দেবে।

বছর শেষে সে মোট পায় চার হাজার টাকা। দিল্লিতে ডুরাণ্ডে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে আসার পরই সে গুলোদার কাছে বাকি টাকাটা চায়। যুগের যাত্রীর সব থেকে ক্ষমতাশালী এই গুলোদা অর্থাৎ ভাইস-প্রেসিডেন্ট "প" ভাদুড়ি। সকালে প্র্যাকটিসের পর প্লেয়াররা কি

খাবে, কোন্ ম্যাচে কোন্ প্লেয়ার খেলবে, কোন্ প্লেয়ারকে যাত্রীতে নেওয়া হবে, এবং কত টাকায়, এসব স্থির করা ছাড়াও গুলোদা এবং তার উপদলের নির্দেশেই নির্বাচিত হয় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, ফুটবল সম্পাদক, এমনকি প্রেসিডেন্টও। ফুটবল চ্যারিটি ম্যাচের বা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের টিকিট গুলোদার হাতেই প্রথমে আসে, তারপর মেম্বারদের বিক্রি করা হয়। আই এফ এ এবং সি এ বি-র তিন-চারটি সাব কমিটিতে গুলোদা আছে। একটি ছোট্ট প্রেসের মালিক গুলোদা গত দশ বছরে দুটি বাড়ি করেছে ভবানীপুরে ও কসবায়।

গুলোদা নম্রস্বরে বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলে।

"সে কি, তুই টাকা পাসনি এখনো!" গুলোদার বিস্ময়ে কমল অভিভূত হয়ে যায়।

"ছি ছি, অন্যায়, খুব অন্যায়। আমি এখুনি তপেনকে বলছি।"

গুলোদা অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপেন রায়কে ডেকে পাঠাল। সে আসতেই ঈষৎ রুষ্টস্বরে বলল, "একি, কমলের টাকা পাওনা আছে যে? না না, যত শিগগিরি পার দিয়ে দাও, কমল আমাদের ডিফেন্সের মূল খুঁটি, ওকে কমজোরি করলে যাত্রী শক্ত হয়ে দাঁড়াবে কি করে!"

কমল সতর্ক হয়ে বলে, "গুলোদা, টাকাটা রোভার্সে যাবার আগেই পাচ্ছি তো?"

"তুই ভাই তপেনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নে।" বলতে বলতে গুলোদা ফোন তুলে ডায়াল করতে শুরু করে দেয়।

তপেন তিনদিন ঘুরিয়ে টাকা দেয়নি। কমলও রোভার্সে

যায়নি। ফুটবল সেক্রেটারির কাছে খবর পাঠায়, হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। তাই শুনে গুলোদা শুধু বলেছিল, "বটে।"

পরের মরশুমের জন্য ফুটবল ট্রান্সফার শুরু হবার আগে গুলোদা ডেকে পাঠায় কমলকে। ও আসামাত্র ড্রয়ার থেকে একশো টাকার দশটি নোট বার করে একগাল হেসে গুলোদা বলে, "গুনে নে। তোরা যদি রাগ করিস, তাহলে যাত্রী চলবে কি করে বলতে পারিস? না না কমল, ছেলেমানুষি করা তোর পক্ষে শোভা পায় না। দশ বছরের ওপর তুই ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছিস। ইণ্ডিয়া কালার, বেঙ্গল কালার পরেছিস। চ্যাংড়া ফুটবলারদের মত তুইও যদি টাকা নিয়ে···না না, তোকে দেখেই তো ওরা শিখবে, ক্লাবকে ভালবাসবে। ইউ মাস্ট বী ডিগনিফায়েড্। এবার ভাল করে গুছিয়ে টিম কর। কাকে কাকে নিতে হবে সে সম্পর্কে ভেবেছিস?"

গুলোদা সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে ইশারা করল। কমল হাতের নোটগুলো প্যাণ্টের পকেটে রেখে চেয়ারে বসতেই গুলোদা আবার শুরু করে, "প্লেয়ার কোথায়? একটু আগে দেবু টাকা চাইতে এসেছিল। বললুম, টাকা তো দেবো, কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে একবার হিসেব কর, ক'মিনিট খেলেছিস, কত গজ দৌড়েছিস, ক'টা ভুল পাশ দিয়েছিস, ক'টা বল রিসিভ করতে পারিস্‌নি, ক'টা ওপেন নেট পেয়ে বাইরে মেরেছিস।···মেম্বাররা লীগ চায়, শীল্ড চায়, আরে বাবা, যে ক'টা প্লেয়ার, সবই তো মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বসে আছে। প্লেয়ার না হলে ট্রফি আনবে কে! একা কমল গুহ যা খেলে তার সিকিও যদি ছুটো

ব্যাক খেলতে পারত, তাহলে ইণ্ডিয়ার সব ট্রফি আমরা পেতাম। ক্লাস—ক্লাস, ক্লাসের তফাত। তোর ক্লাসের প্লেয়ার কলকাতা মাঠে এখন ক'টা আছে আঙুলে গুনে বলা যায়। তুই কিন্তু ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই উইথড্র করবি।"

কমল বলতে শুরু করে, "কিন্তু টাকার কথাটা তো…"

"আহ্, ওসব নিয়ে তোর সঙ্গে কি দর কষাকষি করতে হবে! গত বছর যা পেয়েছিস এবারও তাই পাবি।"

কমল ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই ওল্ড ফ্রেণ্ডসে সই করেই উইথড্র করে। লীগে সাতটি ম্যাচে তাকে ড্রেস করিয়ে সাইড লাইনের ধারে বসিয়ে রাখা হয়। অষ্টম ম্যাচ স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে পাঁচ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় খেলা শেষের দশ মিনিট আগে কোচ বিভাস সেন এসে বলে, "কমল নামতে হবে, ওয়ারম্ আপ করো।"

শোনা মাত্রই ঝাঁঝিয়ে ওঠে কমলের মাথা। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের সামনে আনকোরা প্লেয়ারের মত সেজেগুজে লাইনের ধারে বসে থাকার লজ্জা আর অপমানের ক্ষতে যেন নুনের ছিটে এই দশ মিনিটের জন্য খেলতে নামানো।

"এতদিনে হঠাৎ মনে পড়ল যে?" কমল অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা স্বরে বলে।

"রাগ করিসনি ভাই, বুঝিসই তো, আমার কোন হাত নেই। সবই একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় এখানে।" বিভাস চোরের মত এধার-ওধার তাকিয়ে বলে, "খেলার আগেই গুলোদা বলে দেয় কমলকে দশ মিনিট আগে নামিও।"

কমল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে গ্যালারির দিকে তাকায়। একেবারে উপরে গুলোদা তার নির্দিষ্ট



কমল গুহ যতদিন বল নিয়ে ময়দানে নামবে, ততদিন এই জার্সিকে সে ভয়ে কাঁপ

জায়গাটিতে বসে। কমল সটান উঠে এসে গুলোদার সামনে দাঁড়াল। জার্সিটা গা থেকে খুলে হাতে ধরে বলল, "বয়স হয়েছে, খেলাও পড়ে এসেছে। কিন্তু কমল গুহ যতদিন বল নিয়ে ময়দানে নামবে, ততদিন এই জার্সিকে সে ভয়ে কাঁপাবে।"

জার্সিটা হতবাক্ গুলোদার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে, খালি গায়ে কমল শত শত লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির ভীড় কাটিয়ে গ্যালারি থেকে নেমে আসে। তাঁবুতে এসে জামা-প্যাণ্ট পরে, নিজের বুট এবং অন্যান্য জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে যখন সে বেরোচ্ছে, তখন খেলা শেষের বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে হাউইয়ের মত একটা উল্লাস আকাশে উঠে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল। কমল থমকে পিছন ফিরে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বলল, "এই শব্দকে কাতরানিতে বদলে দেবো।"

যুগের যাত্রী তাঁবুর চৌহদ্দিতে কমল আর পা দেয়নি। পরের বছর ট্রান্সফারের প্রথম দিনেই সে সই করে আসে শোভাবাজার স্পোরটিংয়ে খেলার জন্য। লীগ তালিকায় শেষের যে পাঁচ-ছ'টি দল প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার জন্য জোট পাকায় আর পয়েট ছাড়াছড়ি করে, শোভাবাজার তাদেরই একজন। তিনটি খেলায় ১১ গোল খেয়ে সে বছর ওদের খেলা পড়ে যাত্রীর সঙ্গে। কমল খেলতে নেমেছিল এবং শুধু তারই জন্য যাত্রীর ফরোয়ার্ডরা পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকেই বার বার ফিরে যায়। খেলা ০—০ শেষ হয়। শেষ বাঁশির সঙ্গে মাঠে থমথমে গাম্ভীর্য নেমে আসে।। কমল শোভাবাজারের দু'জন প্লেয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে মাঠ থেকে বেরোবার সময় বলে, "শরীরে আর একবিন্দুও শক্তি নেই রে, নইলে এখন আমি একটা দারুণ চীৎকার করতুম।"

ফিরতি লীগে শোভাবাজারের যখন পঁচিশটা খেলায় ১৪ পয়েন্ট, তখন পড়ল যাত্রীর সামনে। লীগ তালিকায় যাত্রী তখন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান আর এরিয়ান্সের পরে, বি এন আরের ঠিক উপরে। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কোন আশা তো নেই—এটা শুধু ছিল মানরক্ষার খেলা।

হাফ টাইমে যাত্রীর মেম্বাররা কুৎসিত গালিগালাজ করতে করতে গুলোদার দিকে জুতো, ইঁট, কাঠের টুকরো ছুঁড়তে শুরু করে। তাদের চীৎকারের মধ্যে একটা গলা শোনা গেল, "কমলকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল?" খেলার ফল তখন ০—০।

এরপর গুলোদার এক পার্শ্বচর দ্রুত গ্যালারি থেকে নেমে গিয়ে শোভাবাজারের সম্পাদক কৃষ্ণ মাইতির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে এল।

হাফ টাইমের পর মাঠে নামতে গিয়ে কমল অবাক হয়ে দেখল, যে সিধু এতক্ষণ দারুণ খেলে অন্তত তিনটি অবধারিত গোল বাঁচাল, তাকে বসিয়ে নতুন ছেলে ভরতকে গোলে নামানো হচ্ছে। খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাত্রীর লেফট হাফ প্রায় ৩০ গজ থেকে একটি অতি সাধারণ শট গোলে নিল। কমল শিউরে উঠে দেখল, বলটা ধরতে ভরত সামনে এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে গেল, তার সামনেই ড্রপ পড়ে মাথা ডিঙিয়ে বল গোলে ঢুকল।··· মিনিট দশেক পর কমলের পায়ে আবার বল। যাত্রীর ছুটো ফরোয়ার্ড ছু'পাশ থেকে এসে পড়েছে। ওদের আড়াল করে কমল ফাঁকায় দাঁড়ানো রাইট ব্যাককে বলটা দিতেই ছেলেটি কিছু না দেখে এবং না ভেবে আবার কমলকেই বলটা ফিরিয়ে দিল। যাত্রীর লেফট-ইন ছুটে এল বল ধরার জন্য।

পরিস্থিতিটা এমনই দাঁড়াল যে, কর্নার করা অথবা গোল-কীপারকে বলটা ঠেলে দেওয়া ছাড়া কমলের আর কোন পথ নেই। সে গোলের দিকে বলটা ঠেলে দিয়ে দেখল, ভরত অযথা একটা লোক-দেখানো ডাইভ দিল এবং বল তার আঙুলে লেগে গোলে ঢুকল। ০-২ গোলে শোভাবাজার হেরে গেল। গ্যালারির মধ্যেকার সরু পথটা দিয়ে যখন মাথা নিচু করে বেরোচ্ছে, উপর থেকে চীৎকার করে একজন বলল, "কি রে কমল, যুগের যাত্রীকে কাঁপাবি না ?"

তিন দিন পর ভরতকে আড়ালে ডেকে কমল জিজ্ঞাসা করেছিল, "এ রকম করলি কেন ?"

ভরতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তর্ক করার ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে স্বীকার করে, "কেষ্টদা বলল, রেগুলার খেলতে চাস যদি তাহলে ছুটো গোল আজ ছাড়তে হবে। রাজী থাকিস তো নামাবো। আমি লোভ সামলাতে পারলুম না কমলদা। দু' বছর রিজার্ভেই কাটালুম, মাত্র চারটে পুরো ম্যাচ খেলেছি।" তারপরই সে ঝুঁকে কমলের পা দু'হাতে চেপে ধরল। "আমাকে মাপ করুন কমলদা, এমন কাজ আর করব না।" কমল তখন আপন মনে নিজেকে উদ্দেশ করেই বলে, "স্টপার, কোন্ দিকের আক্রমণ তুমি সামলাবে !"

পরের বছর যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলায়, শুরুর সাত মিনিটেই কমল পেনাল্টি বক্সের একগজ বাইরে নিরুপায় হয়ে একজনকে ল্যাং দিয়ে ফেলে দেয়। বাঁশি বাজাতে বাজাতে রেফারী রাধাকান্ত ঘোষ ছুটে এল পেনাল্টি স্পটের দিকে আঙুল দেখিয়ে।

তাজ্জব হয়ে কমল জিজ্ঞাসা করল, "পেনাল্টি কিসের জন্য ?"



ভরত অবধা একটা লোক-দেখানো ডাইভ দিল...

"নো নো, ইট'জ পেনাল্টি।" রাধাকান্ত বলটা হাতে নিয়ে দাগের উপর বসাল।

"বক্সের অনেক বাইরে ফাউল হয়েছে।" কমল নাছোড়-বান্দার মত তর্ক করতে গেল।

"নো আরগুমেন্ট। আই অ্যাম কোয়ায়েট স্িওর অফ ইট।"

"বুঝেছি।" কমল তির্যককণ্ঠে বলল। রাধাকান্ত না শোনার ভান করে বাঁশি বাজাল। কমল চোখ বন্ধ করে দু'কানের পাশে তালু দুটো চেপে ধরল। এখুনি সেই মর্মান্তিক চীৎকারটা উঠবে।

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। কমল অবাক হয়ে চোখ খুলে দেখল, ভরত বলটা দু'হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে উপুড় হয়ে। এরপর শোভাবাজার দ্বিগুণ বিক্রমে যাত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাফ টাইমের আগের মিনিটে রাইট উইং বল নিয়ে টাচ লাইন ধরে তরতরিয়ে ছুটে চমৎকার সেণ্টার করে। বলটা পেনাল্টি বক্সের মাথায় দাঁড়ানো রাইট-ইন্ বুক দিয়ে ধরেই সামনে বাড়িয়ে দেয়। লেফট উইং যাত্রীর দুই ব্যাকের মধ্যে দিয়ে ছিটকে ঢুকে এসে বলটা গোলে প্লেস করা মাত্র রাধাকান্ত বাঁশি বাজিয়ে ছুটে আসে। অফসাইড। তখন কমল মনে মনে বলে, "আক্রমণ, স্টপার কী করে এই আক্রমণ রুখবে!"

যুগের যাত্রী খেলাটা ১—০ জিতেছিল। প্রায় শেষ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে শোভাবাজার গোলের মুখে বল পড়েছিল। ভরত এগিয়ে এসে পাঞ্চ করতেই যাত্রীর রাইট উইংয়ের মাথায় বল আসে। সে হেড করে গোলের দিকে পাঠাতেই ভরত পিছু হটে বলটা ধরতে গিয়ে আটকে যায়।

যাত্রীর লেফট-ইন্ তার প্যাণ্ট ধরে আছে। বিনা বাধায় বল গোলে ঢোকে।

খেলা শেষে মাঠের মধ্যে শোভাবাজার প্লেয়াররা ভিড় কমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় রথীনকে দেখতে পেয়ে কমল হেসে এগিয়ে এসে বলল, "আজ আমরা একগোলে জিতেছি!"

রথীন শুকনো হেসে বলল, "এ বছর আমি যাত্রীর ফুটবল সেক্রেটারি।"

"ওহ্, তাইতো। মনেই ছিল না। সরি, আমার বরং বলা উচিত, রেফারি আজ জিতেছে। এভাবে না জিতে ভাল করে টিম কর্। খেলার মত খেলে জেত্।

কথাটা গায়ে না মেখে রথীন বলল, "এভাবে কদ্দিন তুই আমাদের জ্বালাবি বল্ তো?"

"আমি জ্বালাচ্ছি! তুই তাহলে ফুটবলের 'ফ'-ও বুঝিস না। তোদের গুলোদাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি বোঝেন বলেই আমাকে দু'বছর আগেই ড্রেস করিয়ে সাইড লাইনের বাইরে বসিয়ে রাখতেন।"

"তোকে দেখলে হিংসে হয়, এখনো দিব্যি খেলাটা রেখেছিস, আর আমরা কেমন বুড়িয়ে গেলুম।"

"তার বদলে তুই আখেরটা গুছিয়ে নিতে পেরেছিস। শুনেছি প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কে এখন বেশ বড় পোস্টে আছিস। একটা চাকরি-বাকরি দে না।" হাসতে হাসতে কমল বলল, "তাহলে আর যাত্রীকে জ্বালাব না। খেলে কি আর তোদের মত বড় ক্লাবের সঙ্গে পারা যায়!"

"আর ইউ সিরিয়াস, চাকরি সম্পর্কে? তাহলে টেণ্টে আয়, কথা বলা যাবে।"

"সরি রথীন।" কঠিন হয়ে উঠল কমলের মুখ। "চাকরি আমার দরকার, ছ'মাস ধরে বেকার। কিন্তু যাত্রীর টেণ্টে যাব না।"

আর কথা না বলে কমল সরে আসে রথীনের কাছ থেকে। এসব পাঁচ বছর আগের ঘটনা।

॥ তিন ॥

যুগের যাত্রীর টেণ্টের সামনে রাস্তায় একটা সবুজ পুরনো ফিয়াট মোটর দাঁড়িয়ে। কমল দেখা মাত্র চিনল, এটি রথীনের। মাস ছয়েক আগে রথীনের পদোন্নতি হয়ে ডিপার্টমেণ্টাল ইন চার্জ হয়েছে। এখন মাইনে সতেরো শো। ব্যাঙ্কে রীতিমত ক্ষমতাবান। চলাফেরা কথাবার্তায় সেটা সে সর্বদা বুঝিয়েও দিতে চায়। তাছাড়া রথীন সুদর্শন, যদিও এখন ভুঁড়ি হয়ে আগের মত আর ততটা কমবয়সী দেখায় না।

পাঁচবছর আগে সেদিন রথীনকে নিছকই ঠাট্টা করে কমল চাকবির কথা বলেছিল। পরের দিনই রথীন শোভাবাজার টেণ্টে ফোন করে তাকে দেখা করতে বলে। কমল খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। গোঁয়ারের মত এক কথায় বেঙ্গল জুট মিলের চারশো টাকার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে তু'মাস ধরে অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে আসছিল। কমল ব্যাঙ্কে গিয়ে রথীনের সঙ্গে দেখা করে। রথীন বলে, "আমাদের অফিস টিমে তোকে খেলতে হবে। অফিস স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারিস দরখাস্ত দিয়ে যা। ডেসপ্যাচ সেকশন-এ লোক নেওয়া হবে।"

"মাইনে কত ?" কমল প্রশ্ন করে।

রথীন ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, "যদি বলি একশো টাকা! তু'মাস বেকার আছিস, মাইনে যদি পঞ্চাশ টাকাও হয়, সেটাও তো তোর লাভ।"

কমল আর কথা বাড়ায়নি। পরদিনই দরখাস্ত নিয়ে হাজির হয় এবং যে চাকরিটি পায় তার বেতন এই পাঁচ বছরে ৪৬১ টাকায় পোঁচেছে। কমল জানে, তার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা তাতে এই চাকরি কোনভাবেই তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হত না, যদি না রথীন পাইয়ে দিত। পঞ্চান্ন থেকে ষাট সাল নাগাদ কমল গুহর যে নাম ছিল, এখন তার অর্ধেকও নেই। ফুটবল ভাঙ্গিয়ে চাকরি পাওয়ার দিন তার উতরে গেছে। তবু পেয়েছে একমাত্র রথীনের জন্যই।

সাত বছর পর যাত্রীর টেণ্টে আবার ঢুকতে গিয়ে কমলের মনে হল, তাকে দেখে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবে। কিন্তু কেউ যদি অপমান করার চেষ্টা করে? অবশ্য নিজের জন্য টাকা চাইতে নয় এবং ফুটবল সেক্রেটারি আসতে বলেছে বলেই এসেছি, সুতরাং, কমল মনে মনে বলল—আমার মনে গ্লানি থাকার কোন কারণ নেই।

টেণ্টের বাইরে ইতস্তত ছড়ানো বেঞ্চে যাত্রীর প্রবীণ মেম্বাররা গল্পে ব্যস্ত। তারা কেউ কমলকে লক্ষ্য করল না। টেণ্টের মধ্যে ঢুকে কমলের সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি হল যুগের যাত্রীর অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট তপেন রায়ের। টেবিলে আরো দু'জন লোক বসে। একজনকে কমল চেনে। গুলোদার 'চামচা' হিসাবে খ্যাতি আছে তার।

„আরে, কমল যে, কি ব্যাপার!"

"রথীন কোথায়? এইমাত্র ফোনে আমায় এখানে আসতে বলল।"

"হ্যাঁ, আমার কাছে একশো টাকা চেয়েছিল তোমাকে দেবার জন্য।"

বলতে বলতে তপেন বুক পকেট থেকে একটি নোট বার

করে এগিয়ে ধরল। কমলের মনে হল টাকা নিয়ে তপেন যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছে।

গুলোদার চামচাটি ব্যস্ত হয়ে বলল, "ভাউচারে সই করাতে হবে না ?"

তপেন তাচ্ছিল্যভরে বলল, "না, এটা ক্লাবের টাকা নয়। কমল তো যাত্রীর টাকা ছোঁবে না, আমার পকেট থেকেই দিচ্ছি।"

কমল গম্ভীর গলায় বলল, "টাকাটা কালই রথীনের হাতে দিয়ে দেবো। ও এখন কোথায় ?"

"ঘরে কথা বলছে প্লেয়ারদের সঙ্গে। কাল কুমারটুলির সঙ্গে খেলা।"

কমল ইতস্তত করল। রথীনকে একবার বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্লেয়ারদের সঙ্গে হয়তো কালকের খেলা সম্পর্কে আলোচনা করছে, তাহলে যাওয়াটা উচিত হবে না বাইরের লোকের।

"কমল এ বছর খেলছো তো ?" তপেন রায় হাই চাপার জন্য মুখের সামনে হাত তুলে রেখে বলল। তারপর স্বগতোক্তির মত মন্তব্য করল, "আর কতদিন চালাবে !"

কমল হাসল মাত্র।

"তপেনদা, কমলের বডিটা দেখেছেন !" চামচা বলল। "এখনকার একটা ছেলেরও এমন ফিট বডি নেই।"

তপেন কথাগুলো না শোনার ভান করে তার আগের কথার জের ধরে বলল, "চার ব্যাক হয়ে বয়স্ক ডিফেন্সের প্লেয়ারদের সুবিধেই হয়েছে। কেরিয়ারটার সঙ্গে সঙ্গে রোজগারটাও বাড়াতে পেরেছে। শোভাবাজার থেকে এখন পাচ্ছ কত ?"

"একটা আধলাও নয়।"

তপেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

"ফ্রি সার্ভিস এই বাজারে!" চামচা অবাক হল। "অবশ্য কমল লীগে দুটো ছাড়া তো ম্যাচই খেলে না।"

"শুধু দুটো ম্যাচ! কেন, আর খেলে না?" তপেন প্রশ্ন করল চামচাকে।

"লাস্ট টু ইয়ার্স তো কমল শুধু আমাদের এগেন্‌স্টেই খেলেছে।" চামচা চোখ পিটপিট করল। "যাত্রীকে কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কমল। আমরা ফুল পয়েণ্ট তুলেছি। যাত্রীর জার্সি সকলের সামনে খুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল বটে, কিন্তু দম্ভ রাখতে পারেনি। ফুটবল কি একজনের খেলা!"

কমলের বলতে ইচ্ছে হল, 'প্লেয়ার, অফিসিয়াল, রেফারি, সবকিছু ম্যানেজ করেই তো ফুল পয়েণ্ট তুলেছ।' কিন্তু বলতে পারল না। রথীন স্প্রিংয়ের পাল্লা ঠেলে এই সময় ঘর থেকে বেরোল। সঙ্গে চারটি ছেলে। কমলকে দেখে সে বলল, "অঃ, কখন এলি? তপেনদা দিয়ে দিয়েছেন?"

তপেন ঘাড় নাড়তেই রথীন বলল, "আমি টালিগঞ্জের দিকেই এখন যাব। কমল, তুই তো নাকতলায় যাবি, যদি মিনিট কয়েক অপেক্ষা করিস তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস।"

কমল বলল, "আমি তোর গাড়িতে গিয়ে বসছি। তুই তাড়াতাড়ি কর।"

তপেন মৃদুস্বরে বলল, "টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, কমল।"

"কেন?"

"যখন দরকার হবে আমি চেয়ে নেব। তোমার প্রয়োজনের



যাত্রীকে কিন্তু কাঁপাতে পারেনি কমল।

সময় দিতে পেরেছি, শুধু এইটুকু মনে রাখলেই আমি খুশি হব। তুমি বিপদে পড়ে যাত্রীর কাছেই এসেছ এটা ভাবতে আমার ভালই লাগছে।"

শুনতে শুনতে কমলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল। সে বলল, "আমি টাকা চেয়েছি রথীনের কাছে, যাত্রীর কাছে নয়। চেয়েছি অন্যের জন্য, নিজের জন্য নয়।"

কমল বলতে যাচ্ছিল, এ টাকা যদি যাত্রীর হয় তাহলে এখুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু পল্টুদার মুখটা ভেসে উঠতেই আর বলতে পারল না। তার মনে হচ্ছে, অদ্ভুত একটা খাঁচার মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে, যার চারদিকটাই খোলা অথচ বেরোন যাচ্ছে না।

তপেন তার স্মিত হাসিটা কমলের মুখের উপর অনেকক্ষণ ধরে রেখে বলল, "যদি আরো টাকার দরকার হয় আমাকে বাড়িতে ফোন কোরো। পল্টু মুখার্জির চিকিৎসায় আমাদেরও সাহায্য করা কর্তব্য। এ টাকা ধার নয় কমল, পল্টুদাকে আমার···যুগের যাত্রীর প্রণামী।"

কমল শুনতে শুনতে হঠাৎ নিজেকে অসহায় বোধ করল। তার মনে হচ্ছে, পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল নিয়ে ছুটো ফরোয়ার্ড এগিয়ে আসছে। সে একা তাদের মুখোমুখি। ব্যাকেরা কোথায় দেখার জন্য চোখ সরাবার সময়ও নেই।

গাড়িতে দু'জনের কেউই অনেকক্ষণ কথা বলল না। রেড রোড ধরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের পশ্চিম দিয়ে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে পৌঁচেছে তখন রথীন মুখ ফিরিয়ে বলল, "অফিসের ছুটো খেলায় তুই খেলিসনি!"

"এসব খেলা অর্থহীন, আমার ভাল লাগে না খেলতে।

তাছাড়া শোভাবাজারের প্র্যাকটিস ম্যাচ ছিল। কতকগুলো নতুন ছেলে কেমন খেলে দেখার জন্যই গেছলুম।"

"কিন্তু ব্যাঙ্ক চাকরি দিয়েছে তার হয়ে খেলার জন্য।"

কমল চুপ করে রইল।

"এই নিয়ে কথা উঠেছে। তাছাড়া রোজই তুই কাজ ফেলে সাড়ে তিনটে-চারটেয় বেরিয়ে যাস।"

"কে বলল, নিশ্চয় রণেন দাস?"

"যেই বলুক, সেটা কোনো কথা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তারা মিথ্যে বলেনি।"

পুলিশ হাত তুলেছে। রথীন ব্রেক কষল। ডানদিকে মোড় ফিরে হরিশ মুখার্জি রোডে এবার গাড়ি ঢুকবে। কমল পুলিশটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। রথীন মোড় ঘুরে গিয়ার বদল করে শান্ত মৃদুস্বরে বলল, "বুঝিস না কেন, তোর আর আগের মত নাম নেই, খেলা নেই। এখনকার উঠতি নামী প্লেয়াররা যে অ্যাডভান্টেজ অফিসে পায় বা নেয়, তোর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তোকে এখন চাকরিটাকেই বড় করে দেখতে হবে। তার জন্য যেসব নিয়ম মানতে হয় মেনে চলতে হবে। অন্য পাঁচজনের থেকে তুই এখন আর আলাদা নোস্।"

"আমি আর পাঁচজনেব মত—কোনো তফাতই নেই?" কমল প্রায় ফিসফিস করে বলল।

রথীনের মুখে অস্বস্তিকর বেদনার ছাপ মুহূর্তের জন্য পড়ে মিলিয়ে গিয়েই কঠিন হয়ে উঠল।

"বিপুল ঘোষ, রণেন দাস কি সতু সাহার মত কেরানীদের সঙ্গে আমার তফাত নেই, রথীন এ তুই কি বলছিস! আমি ইণ্ডিয়া টিমে খেলেছি, দেশের জন্য আমার কন্ট্রিবিউশন আছে। জীবনের সেরা সময়ে দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছি, কষ্ট

করেছি, লেখাপড়া করার সময় পাইনি, জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবিনি, সংসারের দিকে তাকাইনি। কি স্যাক্রিফাইস ওরা করেছে, বল্ ? ওরা আর আমি সমান হয়ে যাবো কোন্ যুক্তিতে ?”

রথীন চুপ করে থাকল। গাড়ি চালানোয় ওর মনোযোগটাও বেড়ে গেল হঠাৎ।

“আমি এখনো ফুটবলের জন্য কিছু করতে চাই। প্লেয়ার তৈরী করতে চাই। তাই অফিস থেকে আগে বেরোই। আর অফিস লীগে খেলাটা তো এলেবেলে।”

“কমল, আমাদের দেশে খেলোয়াড়কে ততদিনই মনে রাখে যতদিন সে মাঠে নামে। তারপর স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। নতুন ‘হিরো’ আসে, তাকে নিয়ে নাচানাচি করে। দ্যাখ্ না, যাত্রীতে এখন প্রসূন ভট্চাজকে নিয়ে কী কাণ্ড চলছে, অথচ ওর বাবাকেই একদিন সাপোর্টাররা মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল ঘুষ খেয়েছে বলে। তোকে মনে রাখবে এমন একটা কিছু কর্।”

“রথীন, আমার বয়স হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার মত সামর্থ্য নেই। ফুটবলারের সামর্থ্য তো তার শরীর।”

“তাহলে মন দিয়ে চাকরিটা কর্। তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল। সবাই বলেছিল উঠতি নামী অল্প বয়সীকে চাকরি দিতে। তুই তো জানিস, সেকেণ্ড ডিভিশনে খেলে অপূর্ব ছেলেটাকে চাকরি দেওয়া হবে বলে গত বছর আটটা ম্যাচ খেলানো হয়। ভালোই খেলে কিন্তু এখনো চাকরি পায়নি। কমিটি মেম্বররা বড় বড় নাম চায়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চারজনের নাম উঠেছিল। আমি তর্ক করে বলি, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা

গেছে, অফিসের খেলায় এইসব বড় ক্লাবের নামী প্লেয়াররা একদমই খেটে খেলে না। ওরা থেকেও টিম হারে। এতে অফিসের কোনো লাভ হয় না। বরং পড়তি প্লেয়াররা ভালো সার্ভিস দেয়। তোর জন্য এ-জি-এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি। এখন তুই যদি অফিসের হয়ে না খেলিস তাহলে আমার মুখ থাকে কোথায়? অফিসে নানাদিকে নানাকথা উঠছে, এ রকম ফাঁকি দিলে তো আমাকে তোর এগেনস্টে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে হবে।"

"কিন্তু আমার পক্ষে শোভাবাজারের ম্যাচের দিন পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে থাকা কিংবা অফিসের হয়ে খেলা সম্ভব নয়।"

কমল গোঁয়ারের মত গোঁজ হয়ে বসল। রথীনের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

"অনেকগুলো চাকরি তো ছেড়েছিস। এই বয়সে এই চাকরিটা যদি হারাস, তাহলে কি হবে ভেবে দেখিস। আমার তো মনে হয় না, আর কোথাও পাবি। দেশের লেখাপড়া জানা বেকার ছেলেদের সংখ্যাটা কত জানিস?"

"না, জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। এখানে থামা।"

কমল অধৈর্য ভঙ্গিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল। রথীন একটু অবাক হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

"আরো এগিয়ে তোকে নামিয়ে দিতে পারি।"

"না, এখানেই নামব আর টাকাটা কাল তোকে অফিসেই দিয়ে দেবো।"

কমল গাড়ি থেকে নেমে অনাবশ্যক জোরে দরজাটা বন্ধ করে হনহনিয়ে পিছন দিকে হাঁটতে শুরু করল বাস স্টপের দিকে।

॥ চার ॥

বাসে উঠে দমবন্ধ করা ভীড়ে কমল মাথার উপরের রড্ ধরে মনে করতে চেষ্টা করল পুরনো কথা। তেরো বছর আগে প্রথমবার যুগের যাত্রীতে খেলার সময় রথীন ছিল রাইট ব্যাক, কমল স্টপার। রথীন সে বছর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ক্যাপ্টেন হয়ে লখনৌ থেকে স্যার আশুতোষ ট্রফি এনেছে। মোটামুটি কাজ চালাবার মত খেলত। তখন ডাকত 'কমলদা'। রথীন ছিল গুলোদার খুবই প্রিয়পাত্র। মালয়েশিয়ায় নতুন টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মারডেকা নামে। ইণ্ডিয়া টিম খেলতে যাবে। বোম্বাইয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে বারোজন গিয়েছিল। যাত্রী থেকে তিনজন —রথীন, আমিরুল্লা আর সুনীত। বলা হয়েছিল, কমলের হাঁটুতে চোট আছে তাই ট্রায়ালে পাঠানো হয়নি, তাছাড়া চোখেও নাকি কম দেখছে। দুটোই ডাহা মিথ্যে কথা।

কমল সামান্য একটু চোট পেয়েছিল ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে খেলায়। পরের ম্যাচে কমল বসে, রথীন স্টপারে খেলে কালিঘাটের বিরুদ্ধে।

ভালোই খেলেছিল। তার পরের ম্যাচে এরিয়ান্সের কাছে একগোলে যাত্রী হারে। কমল একটা হাই ক্রসের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে হেড করতে গিয়ে ফসকায়। সেন্টার ফরোয়ার্ড পিছনে ছিল, বলটা ধরেই গোল করে। খেলার পর ক্লাবে কানাঘুষো শোনা যায়, কমল চোখে ভাল

দেখতে পাচ্ছে না।

কমল ছুটে গেছল পল্টু মুখার্জির কাছে।

"পল্টুদা, এরা আমায় বসিয়ে দিল একেবারে।"

"সে কি রে, একেবারে বসে গেছিস!" পল্টুদা সদর দরজার বাইরে একচিলতে সিমেন্টের দাওয়ায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। খুব একচোট প্রথমে হো হো করে হাসলেন।

"বসে গেছিস? কই দেখছি না তো, দিব্বি তো দাঁড়িয়ে আছিস।"

"না পল্টুদা, ঠাট্টা নয়। আর ভালো লাগছে না কিছু। আমি খেলা ছেড়ে দেবো।"

"ভালো লাগছে না বুঝি! আচ্ছা, ভালো লাগার ব্যবস্থা করছি। এখান থেকে একদৌড়ে যাদবপুর স্টেশন যাবি আর একদৌড়ে আসবি। এখুনি।"

কমল কথাটকে আমল না দিয়ে বলল, "আমি সত্যিই খেলা ছেড়ে দেবো। এমন জঘন্য অন্যায়, আমার নখের যুগ্যি নয় রথীন, সে—" বলতে বলতে কমল থেমে গেল।

পল্টুদা ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসেছেন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। দু'চোখে ঘনিয়ে উঠেছে রাগ।

"অরু!" পল্টুদা ঘরের দিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর গলায় ডাকলেন, "অরু, শুনে যা।"

পল্টুদার বড় মেয়ে অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই পল্টুদা বললেন, "আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।"

কমল শোনা মাত্র অজান্তে এক-পা পিছিয়ে গেল। অরুণা অবাক হয়ে বলল, "এখন আবার কোথায় বেরোবে?"

"লাঠিটা নিয়ে আয় বলছি।" পল্টুদা হুঙ্কার দিলেন।



পল্টুদা ইজিচেয়ারে খাড়া হয়ে বসেছেন।

বাচ্চা ছেলের মত কমলের সন্ত্রস্ত মুখটা দেখে অরুণা আঁচ করতে পারল যে, লাঠি আনার কাজটা উচিত হবে না। এ রকম দৃশ্য সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। শুধু মজা করার জন্য বলল, "মোটা লাঠিটা আনব বাবা ?"

পল্টুদা উত্তর দিলেন না। অরুণা ঘরের দিকে পা বাড়ানো মাত্র কমল আর একটিও কথা না বলে ঘুরেই দ্রুত ছুটতে শুরু করল। যতক্ষণ দেখা যায় অপসৃয়মান ছুটন্ত কমলকে দেখতে দেখতে পল্টুদা এগিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারে এসে থুতনি তুলে চেষ্টা করলেন কমলকে দেখার।

অবাক হয়ে রাস্তার লোকেরা তাকিয়ে। বহুলোক কমলকে চেনে। এতবড় এক নামকরা ফুটবলারকে জুতো, জামা আর ফুলপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় সকাল আটটার সময় গিজগিজে ভীড়ের রাস্তা দিয়ে ছুটতে দেখবে, এমন দৃশ্য তারা কল্পনাও করতে পারে না।

পল্টুদা অবসন্নের মত ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। বাঁ হাতটা চোখের উপর রাখলেন। অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাবার কপালে সে হাত রাখতেই পল্টুদা চোখ থেকে বাঁ হাতটা নামালেন। জলের শীর্ণ ধারা দু'টি গাল বেয়ে নেমে আসছে।

"মনে বড় দাগা পেয়েছে ছেলেটা। দুঃখ তো জীবনে আছেই, কিন্তু এমন অন্যায় পথ ধরে দুঃখগুলো কেন যে আসে !" পল্টুদা আবার চোখের উপর হাত রাখলেন।

অনেকক্ষণ পর পল্টুদার রান্নাঘরের জানালায় উঁকি দিল দরদর ঘাম-ঝরা আর পরিশ্রমে লাল হয়ে ওঠা কমলের মুখ।

"অরু !"

অরুণা মুখ তুলল বাটনা বাটা বন্ধ করে।

"পল্টুদা ?" এখনো তো—।"

"অ্যাঁ, এখনো ?"

"হ্যাঁ, লাঠিটা তো হাতেই রেখেছে দেখলাম। তুমি যাদবপুর স্টেশন পর্যন্ত ঠিক গেছ তো ?"

"ফুটবলের দিব্যি।"

"দাঁড়াও দেখে আসি।"

আধ মিনিট পরেই অরুণা ফিরে এসে বলল, "সদর দরজা দিয়ে এসো। না, হাতে লাঠি নেই আর।"

পল্টুদা তখন ছুঁচ-সুতো নিয়ে জামায় বোতাম লাগাতে ব্যস্ত। কমলকে একনজর দেখে বললেন, "খেয়ে এসেছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে কেমন আছে ? বয়স কত হল ?"

"ভালো, পাঁচ বছর পূর্ণ হবে এই সেপ্টেম্বরে।"

"প্র্যাকটিসটা আরো ভালো করে কর্। হতাশা আসবে, তাকে জয় করতেও হবে। ইণ্ডিয়া টিমে খেললেই কি বড় প্লেয়ার হয় ? বড় তখনই হয়, যখন সে নিজে অনুভব করে মনের মধ্যে আলাদা এক ধরনের সুখ, প্রশান্তি। সেখানে হতাশা পৌঁছয় না। তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"

কমল মাথা নিচু করে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটা অদ্ভুত ক্ষোভ আর কান্না মিলেমিশে তখন তার বুকের মধ্যে ফুলে উঠেছিল।

আর এখন, তেরো বছর আগের ওইসব কথা মনে করতে করতে যখন সে বাস থেকে নেমে মিনিট চারেক হেঁটে

পল্টুদার বাড়িতে ঢুকল, তখন একটা অদ্ভুত মমতা আর বেদনা কমলের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠছিল। থাক্ দেওয়া তিনটে বালিশের উপর হেলান দিয়ে পল্টুদা আধশোয়া। ওকে দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

"ভালই আছি।" মৃদুস্বরে পল্টুদা বললেন।

"কথা বলা একদম বারণ।" অরুণা কথাটা বলল কমলকে লক্ষ্য করে।

কমল তাকাল অরুণার দিকে। সাদা থান পরনে। পাঁচ বছর আগে বিধবা হয়ে একটি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতেই রয়েছে। এখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। পল্টুদা আরো তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। স্ত্রী দু'বছর আগে মারা গেছেন। সংসারে ছোট মেয়ে বরুণা ছাড়াও আছে এক বিধবা বোন। শুকনো মুখে তারা খাটের ধারে দাঁড়িয়ে। অরুণার ছেলে পিন্টু দাত্নর খাটের একধারে বসে।

"কেমন আছেন?" কমল ফিসফিস করে অরুণাকে জিজ্ঞেস করল। "ডাক্তার দেখানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ, বললেন কিছু করার নেই।"

"ওষুধ?"

"দিয়েছেন লিখে। আনা হয়নি। বাবাই বারণ করলেন।"

"প্রেসক্রিপসানটা দাও।" কমল হাত বাড়াল।

পল্টুদা ওদের দিকেই তাকিয়েছিলেন। ক্লান্ত এবং গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার জন্য আর টাকা নষ্ট করার দরকার নেই।"

বাড়ানো হাতটা কমল সন্তর্পণে নামিয়ে নিল।

"আর কেউ আসেনি?" কমলের প্রশ্নে অরুণা মাথা নাড়ল। পল্টুদার হাতে গড়া চারজন প্লেয়ার ইণ্ডিয়া টিমে খেলেছে, পনেরোজন বেঙ্গল টিমে।

"ব্যালান্স, কমল, ব্যালান্স কখনো হারাসনি। আমি ব্যালান্স রাখতে পারিনি তাই কিছুই রেখে যেতে পারছি না, একমাত্র তোকে ছাড়া।" পল্টুদা ডান হাতটা পিণ্টুর মাথায় রেখে চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বললেন, "এই পৃথিবীটা ঘুরছে ব্যালান্সের ওপর। মানুষ হাঁটে ব্যালান্সে, দৌড়য়, ড্রিবল করে, এমন কি মানুষের মনও রয়েছে ব্যালান্সের ওপর। চালচলনে, ব্যবহারে ও চিন্তাধারায় কখনো ব্যালান্স হারাসনি। কে আমায় দেখতে এল কি এল না, তাই নিয়ে আমার আর কিছু যায়-আসে না। তুই এসেছিস, জানতুম তুই আসবি।" একমুহূর্ত থেমে বললেন, "এদের তুই একটু দেখিস। আজ তোর কাছে এইটেই আমার শেষ চাওয়া।"

"পল্টুদা, আমি থাকলে আপনি কথা বলেই যাবেন, তার থেকে আমি বরং চলে যাই।"

"পারবি যেতে?" মুচকি হাসলেন পল্টুদা, "যদি বলি আমার সামনে তুই শুধু দাঁড়িয়ে থাক্। আমি তোকে দেখব আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে তোর বল কন্ট্রোল, মুখ তুলে বলটাকে পায়ে স্ট্রোক দিতে দিতে এগিয়ে যাওয়া, এধার ওধার তাকানো। আমার তখন কেন জানি না অভিমন্যুর কথা মনে পড়ত। শুটিংয়ের পর ফলো থ্রু-র ভঙ্গিটা, আর সেই ডজটা। ডান দিকে হেলে, বাঁ দিকে ঝুঁকেই আবার ডান দিকে—একটুও স্পিড না কমিয়ে। পারিস এখনো?"

"না। আমার বয়স হয়ে গেছে পল্টুদা।"

"না, হয়নি। চেষ্টা করলেই পারবি। করবি?"

কমল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল—পল্টুদার মুখের দিকে। শীর্ণ মুখে দুটি চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত জ্বলজ্বল করছে। প্রায় কুড়ি বছর আগে অমন করে তাকাতেন।

"তুই আমার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছিস সেটা দেখাবি ?" পল্টুদার সেই হুকুমের গলা নয়, মিনতি।

কমলের হাত অদৃশ্য সুতোর টানে পুতুলের মত মাথায় উঠে গেল। চুলগুলো ফাঁক করে মাথা হেঁট করল পল্টুদাকে দেখাবার জন্য। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা হেলিয়ে অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ করব।"

তার চোখে পড়ল খাটের নীচে একটা রবারের বল, সম্ভবত পিন্টুর। কমল বলটা পা দিয়ে টেনে আনল। চেটোর তলা দিয়ে বলটাকে ডাইনে বাঁয়ে খেলালো। তাই দেখে পিন্টু খাট থেকে নেমে গুটিগুটি কমলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ কচি পা-টা বাড়িয়ে দিল। বলটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে লাগল। ঘরে একমাত্র পিন্টু ছাড়া আর কেউ হেসে উঠল না।

ছিলে-টানা ধনুকের মত কমল কুঁজো হয়ে গেল নিজের অজান্তেই। সামনে যেন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বল কেড়ে নিতে অপেক্ষা করছে। কমল একদৃষ্টে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলটাকে চেটো দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে গড়িয়ে গড়িয়ে সারা ঘরটা ঘুরতে লাগল. পিন্টু এলোপাথাড়ি লাথি ছুঁড়ছে, বলে পা লাগাতে পারছে না। কমল হঠাৎ একটা পাক দিয়ে পিন্টুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরের উপরটা ডাইনে ঝাঁকিয়ে, বাঁয়ে হেলেই সিধে হয়ে গেল। পিন্টু ব্যালান্স হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে



কমলের কোন খেয়াল নেই।...আপন মনে বলটাকে নিয়ে দুলে দুলে সারা ঘর ঘুরছে।

সকলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে অরুণাকে জড়িয়ে ধরল লজ্জা লুকোবার জন্য।

কমলের কোন খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে সে ভুলে গেল ঘরটাকে, ঘরের মানুষদের, মৃত্যুপথযাত্রী পল্টুদাকেও। তার মনে হচ্ছে সে মাঠেই নেমে খেলছে। গ্যালারী ভরা দর্শক তাকে তুমুল উচ্ছ্বাসে তারিফ জানাচ্ছে। প্রমত্ত নটরাজের মত কমল বুঁদ হয়ে আপন মনে বলটাকে নিয়ে তুলে তুলে সারা ঘর ঘুরছে। কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে একের পর এক কাটাচ্ছে। বলটাকে পায়ের পাতার উপর তুলে নাচাতে নাচাতে উরুর উপর, সেখান থেকে কপালে। আবার উরু, আবার পাতায়—কমলের সর্বাঙ্গে বল খেলা করছে।

পল্টুদা নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মুখ হাসিতে ভরে রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ বুঁজলেন।

কিছুক্ষণ পর মৃদুস্বরে অরুণা বলল, "কমলদা, বাবা বোধহয় মারা গেলেন!"

॥ পাঁচ ॥

সকাল নটায় অফিসে বেরিয়ে পরদিন রাত নটায়, ছত্রিশ ঘণ্টা পর কমল বাড়ি ফিরল। চোখ দুটি লাল, চুল এলোমেলো, ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছে সটান শরীরটা।

একতলায় দুটি ঘর নিয়ে কমল থাকে। একটিতে সে, অপরটিতে অমিতাভ। দুটি লোকের এই সংসারের যাবতীয় কাজ ও রান্না করে দিয়ে কালোর মা রাতে চলে যায়। দশ বছর আগে শিখা মারা যাবার পরই সাত বছরের অমিতাভকে তার দিদিমা গৌহাটিতে নিয়ে চলে যান। দু'বছর আগে সে বাবার কাছে ফিরেছে। প্রথমে দু'জনের সম্পর্কটা ছিল স্কুলে ভর্তি হওয়া নতুন দুটি ছেলের মত।

দু' বছরেও কিন্তু ওদের মধ্যে ভাব হয়নি। ওরা কথা কমই বলে, দু'জনে দু'জনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। কেউ কারুর ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। তবে একবার রেজেস্ট্রি চিঠি সই করে নেবার জন্য অমিতাভের ঘরে কমল ঢুকেছিল কলমের খোঁজে। একটা খাতার মধ্যে কলম পায়। তখন দেখেছিল, খাতাটা কবিতায় অর্ধেক ভরা আর টেবিলের উপর থাক দিয়ে রাখা বইয়ের ফাঁকে অমিতাভের মায়ের ফোটো। ছবিটা কমলের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ছিল। কমল দুঃখ পেয়েছিল। অমিতাভ তার মা'র ছবিটা চুরি না করে যদি চেয়ে নিত তাহলে সে খুশিই হতো। মেধাবী গম্ভীর মৃদুভাষী ছেলেকে কমল ভালোবাসে। শুধু অস্বস্তি বোধ

করে তার দুর্বল পাতলা শরীর ও পুরু লেন্সের চশমাটার দিকে তাকালেই। অমিতাভ তার বাবাকে 'আপনি' বলে। কমলের ইচ্ছে ও 'তুমি' বলুক।

অমিতাভের ঘরে আরো দুটি ছেলে বসে কথা বলছে। কমল একবার সেদিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। ইজিচেয়ারটা পাতাই ছিল, তাতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। একে একে তার মনে ভেসে উঠতে লাগল গত চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপারগুলো। কান্না, ছোটাছুটি, টেলিফোন করা, শ্মশান যাওয়া, আবার পল্টুদার নাকতলার বাড়ি। পল্টুদার জামাইরা এসেছিল, তাদের আর্থিক সঙ্গতিও ভাল নয়। একশোটা টাকা খুবই কাজে লেগেছে।

পায়ের শব্দে কমল চোখ খুলল। অমিতাভ, তার পিছনে ছেলে দুটি।

"এরা আমার কলেজের বন্ধু, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।" অমিতাভর বিব্রত স্বর কমলের কানে বিশ্রী লাগল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সে বলল, "আজ থাক, অন্য আর একদিন এসো। আজ আমার শরীর মন দুটোই খারাপ।"

কথা না বলে ওরা চলে গেল। কমল আবার চোখ বন্ধ করল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রতিদিনের মত ঠিক পাঁচটায় ওর ঘুম ভাঙল। ঘরের আলোটা পর্যন্ত নেভান হয়নি, জামা-প্যাণ্টও বদলান হয়নি। কমল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে হীটারে চায়ের জল বসিয়ে, প্রতিদিনের মত অমিতাভের ঘরের দরজায় কয়েকটা টোকা দিয়ে, খাওয়ার টেবিলে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। অমিতাভ এসে যখন চেয়ার টেনে বসল তখন চা তৈরী হয়ে গেছে।

"পরশু আমার গুরু মারা গেলেন, তাই বাড়ি ফেরা হয়নি।"

অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, "কে ?"

"পল্টু মুখার্জি।" কমল আর কিছু না বলে অমিতাভর একমনে রুটিতে জেলি মাখানো দেখতে লাগল।

"তুমি অবশ্য ওঁর নাম নিশ্চয় শোনোনি।"

"না। খেলার আমি কিছুই জানি না।"

"পল্টুদা হচ্ছেন," কমল উৎসাহ দেখিয়ে বলে উঠল, "সাহিত্যে যেমন ধরো…"

অমিতাভর পুরু লেন্সের ওধারে চোখ দুটোকে কৌতুক-ভরে তাকিয়ে থাকতে দেখে কমল ঘাবড়ে গেল।

"যেমন রবীন্দ্রনাথ ?"

"না না, অতবড় নয়!" কমল অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। এবং অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু আমার জীবনে উনি রবীন্দ্রনাথের মতই।"

"তাহলে আপনি খুবই আঘাত পেয়েছেন।"

কমল চুপ করে রইল।

"মা মারা যেতে আঘাত পেয়েছিলেন কি ?"

কমল তীব্র দৃষ্টিতে অমিতাভর দিকে তাকাল। সে মাথা নামিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

"তোমার মা মানিয়ে নিতে পারেনি আমার জীবনকে, আকাঙ্ক্ষাকে। একজন ফুটবলারের স্ত্রী হতে গেলে তাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়, সহ্য করতে হয়। তা করার মত মনের জোর তার ছিল না। ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে থেকেছি, টুর্নামেন্ট খেলতে বাইরে গেছি—এ-সব সে পছন্দ করত না। তাই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। ওর ইচ্ছার

বিরুদ্ধেই যাত্রীর সঙ্গে রোভার্সে খেলতে যাই। তখনি ঘটনাটা ঘটে।"

"মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আপনাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু আপনি আসেননি।" অমিতাভ কঠিন ঠাণ্ডা গলায় অভিযুক্ত করল কমলকে। 'আসেননি'-র পর নিঃশব্দে একটি 'কেন' আপনা থেকেই ধ্বনিত হলো কমলের কানে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে পুড়ে গেল তার মুখের কোমল বিষাদটুকু।

"আগেও বলেছি তোমায়, সেই টেলিগ্রাম আমাদের ম্যানেজার গুলোদার হাতে পড়ে। সেটাকে তিনি চেপে রাখেন, কেননা পরদিনই ছিল হায়দ্রাবাদ পুলিশের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলা। আমাকে বাদ দিয়ে যাত্রীর পক্ষে খেলতে নামা সম্ভব ছিল না।" কথাগুলো বলতে বলতে কমল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল অমিতাভর দিকে।

বাঁকানো ঠোঁটের কোলে মোটাদাগে আগের মতই অবিশ্বাস ফুটে রয়েছে। আজও ওকে বোঝানো গেল না, টেলিগ্রামটা পেলে সে অবশ্যই খেলা ফেলে বোম্বাই থেকে ছুটে আসত।

কমল খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ল। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বোলাল। বেশ বড় হয়েছে। কিন্তু অফিসে যেতে ইচ্ছে করছে না। দাড়ি না কামালেও চলে। গালে কয়েকটা পাকা চুল। কমল কাঁচি দিয়ে সেগুলো সাবধানে কাটতে বসল।

সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। কালোর মা বোধহয়, কিংবা খবরের কাগজওলা। কমল কাঁচি রেখে প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বার করতে লাগল। বাজার করে

কালোর মা। টাকা পেতে দেরি করলে গজগজ শুরু করে।

"কমল দা!"

সলিল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে।

"কি রে, এত সকালে?"

"মাঠ থেকে আসছি। প্র্যাকটিস করতে গেছলুম।"

"তোর না পায়ে চোট!"

"ডাক্তারবাবু বললেন কিছু নয়, রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।" সলিল খাটের উপর বসল। কমলের মনে হলো ও যেন অন্য কিছু বলতে এসেছে।

"পল্টুদা মারা গেলেন?"

"হুঁ। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছিল।" কমল দাড়ি কাটতে কাটতে আয়নার মধ্যে দিয়ে সলিলকে লক্ষ্য করতে লাগল।

"কিছু বলবি আমায়?"

সলিল মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝেয় কিছুক্ষণ ঘষাঘষি করে ধরা গলায় বলল, "কমলদা, দু'দিন আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। আমাদের সংসারে আটটা লোক।"

কমল ভেবে পেল না এখন সে কি বলবে! এ রকম কথা প্রায়ই সে শোনে ময়দানে। প্রথম প্রথম একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে কেঁপে উঠত, এখন শুধু তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে যায়।

"একটা কার্ডবোর্ড কারখানায় কাজ পেয়েছি, হপ্তায় আঠারো টাকা। আজ থেকেই কাজে লাগতে হবে।"

"ফুটবল?"

সলিল আবার মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। কমল

দেখল, টসটস করে ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছে। তারপর নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওকে ডাকবে ভেবেও কমল ডাকল না।

জীবনে প্রথম বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে ছেলেটা। এখন ওর মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে ফুটবলের সঙ্গে সংসারের। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মায়া-মমতা-ভালবাসার। যদি ফুটবলকে ভালবাসে, বড় খেলোয়াড় হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহলে ওকে নিষ্ঠুর হতে হবে। সংসারের সুখ-দুঃখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বাঙালীরা বড় কোমল। বেশির ভাগ ছেলেরাই তা পারে না। সংসারের সর্বগ্রাসী হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে যায়। ও নিজেই সিদ্ধান্ত নিক। দু-চার টাকা দিয়ে করুণা করে ওকে ফুটবলার হয়ে ওঠায় সাহায্য করা যাবে না।

কমলের নিজের কথা মনে পড়ে গেল। মা মারা যাবার পর সংসার দেখাশুনোর জন্য জোর করে বাবা তার বিয়ে দেয়। তখন বয়স মাত্র কুড়ি। তারপর অদ্ভুত একটা লড়াই তাকে করে যেতে হয় অমিতাভর মায়ের সঙ্গে। কিন্তু ছেলে সে-সব কথা বুঝবে না। ওর বন্ধুরা আগ্রহ নিয়ে আলাপ করতে আসে অথচ অমিতাভ তার বাবার খেলা সম্পর্কে উদাসীন। একদিনও বলেনি, টিকিট দেবেন—খেলা দেখতে যাব! কমলের বহু দিনের সাধ ছেলে তার খেলা দেখতে আসুক।

"বাবা, দর্জির দোকান থেকে আজ প্যান্টটা আনার তারিখ।"

"আজকেই," কমল ব্যস্ত হয়ে চাবি নিয়ে দেরাজের দিকে এগোল। "কত টাকা?"

"কুড়ি।"

টাকাটা অমিতাভর হাতে দেবার সময় কমলের মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল, সলিল হপ্তায় মাত্র আঠারো টাকা মাইনের একটা চাকরি নিচ্ছে। অমিতাভ আর সলিল প্রায় এক বয়সী হবে।

॥ ছয় ॥

বিকেলে কমল শোভাবাজার টেণ্টে এল। পল্টু মুখার্জির মারা যাবার খবর সবাই জেনে গেছে। কমলকে অনেকের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। শোভাবাজারের কোচ সরোজ বলল, "কমলদা, কাল রাজস্থানের সঙ্গে খেলা। একবার তো বসতে হয় টিমটা করার জন্য।"

"বসার আর কি আছে! আগের ম্যাচে যারা খেলেছে, তাদেরই খেলাও। শুরুতেই বেশি নাড়াচাড়া করার দরকার কি?"

"সলিল বলছে, খেলবে। কিন্তু আমি মনে করি না ও ফিট। সকালে প্র্যাকটিসে দেখলাম, ছুটো ফিফ্‌টি মিটারে স্প্রিন্ট করার পর লিম্প্‌ করছে। লাফ দেওয়ালাম, পারছে না।"

"অন্তত দু-সপ্তাহ রেস্ট দাও।"

"কিন্তু রাইট স্টপারে খেলবে কে? প্লেয়ার কোথায়? সত্য বা শম্ভু জানেনই তো কেমন খেলে। স্বপনকে হাফ থেকে নামিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ফরোয়ার্ড লাইনকে ফিড করাবে কে? রুদ্রকে দিয়ে আর যাই হোক, বল ডিস্‌ট্রি-বিউশনের কাজ চলে না।"

"তাহলে?" কমল চিন্তিত হয়ে সরোজের মুখের দিকে তাকাল এবং ম্লান হেসে বলল, "অগত্যা আমি?"

সরোজ মাথা হেলাল।

"কিন্তু এ সিজনে দু-তিনদিন মাত্র বলে পা দিয়েছি। ভালোমত ট্রেনিং করিনি।"

"তাতে কিছু এসে যায় না।" সরোজ উৎসাহভরে বলল। "এক্সপিরিয়েন্সের কাছে সব বাধা ভেসে যাবে। আমার ডিফেন্সে সব থেকে বড় অভাব অভিজ্ঞতার। মোহনবাগানের দিন দেখেছেন তো, চারটে ব্যাক এক লাইনে দাঁড়িয়ে, এক-একটা থ্রু পাশে চারজনই কেটে যাচ্ছে। ওরা প্রচণ্ড পেসে খেলা শুরু করল আর এরাও তার সঙ্গে তাল দিয়ে মাঠময় ছোটাছুটি করে আধ ঘণ্টাতেই বে-দম হয়ে গেল। গেমটাকে যে স্লো ডাউন করবে, বল হোল্ড করে করে খেলবে—কেউ তা জানে না।"

"জানবে, খেলতে খেলতেই জানবে। আচ্ছা, আমি কাল খেলব। কাল সকালে ছেলেদের আসতে বলে দিও মাঠে। একটু প্র্যাকটিস করব।"

"খেলার দিনে ?"

"সামান্য। দু-চারটে মুভ প্র্যাকটিস করাব। ভয় নেই, তোমার প্লেয়ারদের এক ঘণ্টার বেশি মাঠে রাখব না।"

সরোজের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কমল বুঝল, ব্যাপারটা ও পছন্দ করছে না। কোচের আত্মমর্যাদায় লেগেছে। কমল সুর বদল করে মৃদু স্বরে এবং বন্ধুর মত বলল, "আমাদের মত ছোট ক্লাব, সঙ্গতি কিছুই নেই। প্লেয়াররা অত্যন্ত কাঁচা, অমার্জিত, সিজনের শেষ দিকে ম্যাচ গট-আপ করে ফার্স্ট ডিভিশনে টিকে থাকতে হয়—এদের নিয়ে আর্টিস্টিক ফুটবল খেলতে গেলে পরিণাম কি হবে তা কি ভেবেছ ? এই বছর প্রথম গড়ের মাঠে কোচিং করছ, তুমি কি চাও এটাই তোমার শেষ বছর হোক ?"

সরোজের মুখ ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডুর হয়েই কঠিন হয়ে উঠল। "আমি ফুটবল খেলাতে চাই, কমলদা। ফুটবল খেলে শোভাবাজার নেমে যাক্ আমার দুঃখ নেই, আমিও যদি সেই সঙ্গে ডুবে যাই, আফসোস করব না। কিন্তু শুরুতেই আত্মসমর্পণ করব না।"

"তোমার এই মনোভাব শোভাবাজারের অফিসিয়ালরা জানে? কেষ্টদা জানে?"

"জানলে এই মুহূর্তে ক্লাবে ঢোকা বন্ধ করে দেবে।" সরোজ হাসিটা লুকোল না।

"সরোজ, তোমায় বলাই বাহুল্য, তবু দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তোমার থেকে বোধ হয় আমি বেশি খেলেছি, বড় বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও বেশি। সেই সূত্রে, বরং বলা ভালো, আলোচনা করতে চাই।"

"কমলদা, এ সব বলছেন কেন, আপনার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। আপনার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে।" সরোজ বিনীতভাবে বলল।

"তুমি যেভাবে খেলাতে চাও, সেইভাবে খেলার মত প্লেয়ার আমাদের আছে কি?"

"নেই।" সরোজ চটপট জবাব দিল।

"তাহলে আমরা একটার পর একটা ম্যাচ হারবো। শেষে পয়েন্ট ম্যানেজ করার নোংরা ব্যাপারে ক্লাব জড়াবেই, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। লাভ নেই সরোজ আর্টিস্টিক ফুটবলে। যতদিন না উপযুক্ত ছেলেদের পাচ্ছ ততদিন তোমার চিন্তা শিকেয় তুলে রাখ। আগে ক্লাবকে বাঁচাও, তারপর খেলা। আগে ছেলে যোগাড় করো, তাদের তৈরী করো। আগে ডিফেণ্ড করো, তারপর কাউণ্টার অ্যাটাক। সর্বক্ষেত্রে

এইটাই সেরা পদ্ধতি, জীবনের ক্ষেত্রেও।"

"তার মানে যেমন চলছে চলুক!"

"হ্যাঁ, তবু এর মধ্যেই ডিফেন্সটাকে আরো শক্ত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তোমার যা কিছু ট্যাকটিকস্, সত্তর মিনিটের পুরো খেলাটায়, সব কিছুর মূলেই জমি দখলের, স্পেস কভার করার চেষ্টা। ফাঁকা জমিতে বল পেলে বল কন্ট্রোল করার সময় পাওয়া যায়। স্পেসই হচ্ছে সময়। অপোনেন্টকে জমির সুবিধা না দেওয়া মানে সময় না দেওয়া। তাই এখন ম্যান টু ম্যান টাইট মার্কিং খেলা হয়। আমি তিন ব্যাকে খেলেছি, অনেক গলদ তখন ডিফেন্সে ছিল। চার ব্যাকে সেটা বন্ধ হয়েছে। আগে উইঙ্গাররা পঁচিশ গজ পর্যন্ত ছাড়া জমি পেত, চার ব্যাকে সেটা পাঁচ গজ পর্যন্ত কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু চার ব্যাকেও লক্ষ্য করেছ, শোভাবাজার সামলাতে পারে না।"

"আপনি কি পাঁচ ব্যাকে খেলাতে চান!"

"প্রায় তাই। চার ব্যাকের পিছনে একজন ফ্রি ব্যাক রেখে খেলে দেখলে কেমন হয়। ফরোয়ার্ড থেকে একজনকে হাফে আনা যায়, দু'জনকেও আনা যায়। ফরমেশানটা ১—৪—৩—২ হবে।"

"আপনি কাতানাচ্চিও ডিফেন্স চাইছেন অর্থাৎ ফুটবলকে খুন করতে চাইছেন?"

সরোজ হঠাৎ গোঁয়ারের মত রেগে উঠল। কমল এই রকম একটা কিছু হবে আশা করেছিল। সে বলল, "মোহনবাগানের কাছে আমরা পাঁচ গোল খেয়ে দুটো পয়েন্ট হারাতুম না এই ফরমেশনে খেললে। একটা পয়েন্ট পেতুমই। সেটা কি মন্দ ব্যাপার হত? তুমি মিড ফিল্ড

খেলার ওপর বড় বেশি জোর দাও, কিন্তু এখন ওটার আর কোন গুরুত্বই নেই। এখন লড়াই পেনাল্টি এরিয়ার মাথায়—অ্যাটাকিং অ্যাঙ্গেলকে সরু করে গোলে শট নেওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তুমি এটা বুঝছ না কেন, গোল করাই হচ্ছে খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য, খেলা জেতা যায় গোল করেই। শোভাবাজারের ক্ষমতা নেই গোল দেওয়ার কিন্তু গোল খাওয়া তো বন্ধ করতে পারে।"

"কমলদা, আপনার আর আমার চিন্তাধারা এক খাতে বোধহয় বইছে না। শোভাবাজার টিম যতদিন আমার হাতে থাকবে, আমি আমার চিন্তা অনুসারেই খেলাতে চাই।"

সরোজ কঠিন এবং দৃঢ়স্বরে যেভাবে কথাগুলি বলল তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আর তর্ক করতে সে রাজী নয়। কমল মুখটা ঘুরিয়ে আলতো স্বরে বলল, "বেশ।"

"কাল তাহলে খেলছেন?"

কমল মাথা হেলিয়ে হাসল।

॥ সাত ॥

দু'দিন কামাই করে কমল অফিসে এল। রণেন দাসকে চেয়ারে দেখতে পেল না। খাটো চেহারার ঘোষদা অর্থাৎ বিপুল ঘোষকে অবশ্য প্রতিদিনের মত কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় চেয়ারে বসে কাগজে লাল কালিতে 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়' লিখতে দেখা যাচ্ছে। প্রায় সাড়ে চারশো লোকের বিরাট পাঁচতলা অফিস বাড়িটা হট্টগোলে মুখর। সাড়ে দশটার আগে কেউ কলম ধরে না। কমলদের ডেসপ্যাচ বিভাগে তারা মাত্র তিনজন।

বিপুল তার নিত্যকর্ম সেরে কমলকে বলল, "দু'দিন আসেননি, অসুখবিসুখ করেছিল ?"

"এক আত্মীয় মারা গেলেন তাতেই ব্যস্ত ছিলাম। ঘোষদা, আপনার কাছে লীভ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে ?"

বিপুল ড্রয়ার থেকে ছুটির দরখাস্তের ফর্ম বার করে দিল। কমল তাতে যা লেখার লিখে সেটা নিয়ে নিজেই গেল চারতলায় লীভ সেকশনে জমা দিতে। সেখানে অনুপম ঘোষালকে ঘিরে অল্পবয়সীরা জটলা করছে। অনুপম যুগের যাত্রীর উঠতি রাইট উইঙ্গার। রথীনই চাকুরি করে দিয়েছে। কাল অনুপম হ্যাটট্রিক করেছে কুমারটুলির বিরুদ্ধে।

"আর একটা গোল কি অনুপমের হত না। সেকেণ্ড হাফের শুরুতেই প্রসূন তিনজনকে কাটিয়ে যখন সেলফিসের মত একাই গোলটা করতে গেল, তখন অনুপম তো ফাঁকায়

গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে। প্রসূন ওকে বলটা যদি দিত, তাহলে কি অনুপমের আর একটা গোল হত না? কি অনুপম, হত কি না?"

মৃদু হেসে অনুপম বলল, "ফুটবল খেলায় কিছুই বলা যায় না।"

"প্রসূনকে তুই দোষ দিচ্ছিস কেন? অনুপমকে বল দেবে কি, ও তো তখন ক্লিয়ার অফ সাইডে!"

"বাজে কথা। অনুপম, তুই তখন অফ সাইডে ছিলিস কি?"

অনুপম গম্ভীর হয়ে মুখটা পাশে ফিরিয়ে বলল, "লেফট-ব্যাক আর আমি এক লাইনেই ছিলুম।"

"তবে, তবে! আমি কতদিন বলেছি প্রসূনটা নাম্বার ওয়ান সেলফিস। বল পেলে আর ছাড়ে না, একাই গোল দেবে। ওর জন্য যাত্রীর অনেক গোল কমেছে। বালী প্রতিভার দিন পাঁচটা গোল হলো বটে, কিন্তু প্রসূন ঠিক ঠিক যদি বল দিত অনুপমকে, অন্তত আরো পাঁচটা গোল হত। অনুপম হার্ডলি চারটে বলও প্রসূনের কাছ থেকে পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কি অনুপম, ঠিক বলেছি কিনা?"

অনুপম উদাসীনের মত হেসে বলল, "যাকগে ওসব কথা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাদ দে তো ফালতু কথা। প্রসূন বল দিল কি না দিল তাতে অনুপমের কিছু আসে যায় না। এর পরের ম্যাচ ইসটার্ন রেল। অনুপম, আগেই কিন্তু বলে রাখছি, আমার ভাগ্নেটা ধরেছে খেলা দেখার জন্য।"

"সত্যদা, আজকাল ঢোকানো বড্ড শক্ত হয়ে পড়েছে। ডে-স্লিপ দেওয়ার ব্যাপারেও গোনাগুনতি।"

"ওসব কোন কথা শুনব না। তোমায় ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।"

অনুপম সেকশনাল ইন-চার্জ নির্মল দত্তর টেবিলের দিকে এগোবার উদ্যোগ করে বলল, "আচ্ছা দেখি।"

দত্তর কাছে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে অনুপম রোজই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

"অনুপম, ইস্ট বেঙ্গলের দিন কিন্তু এই রকম খেলা চাই।"

অনুপম এগিয়ে যেতে যেতে হাসল মাত্র।

এবার ওদের চোখ পড়ল কমলের ওপর। দরখাস্তটা হাতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছে।

"কি ব্যাপার কমলবাবু, ক্যাজুয়াল? এই টেবিলে রেখে যান।"

কমল রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, একজন ডেকে বলল, "আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় অনুপমের খেলা সম্পর্কে? দারুণ খেলে, তাই নয়?"

"হ্যাঁ, দারুণ খেলে।"

"আপনি ওর এ-বছরের সব ক'টা খেলাই দেখেছেন?"

"একটাও না।"

"তাহলে যে বললেন দারুণ খেলে!"

"আপনারা বলছেন তাই আমিও বললাম।"

"না না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলুন, ছেলেটার মধ্যে পার্টস আছে কি না। আপনার চোখ আর আমাদের চোখ তো এক নয়।"

কমল কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর কঠিনস্বরে বলল, "শুধু খেলা দেখেই প্লেয়ার বিচার করবেন না। খেলা সম্পর্কে তার অ্যাটিচিউড, চিন্তা, সাধনা কেমন সেটাও

দেখবেন। হয়তো ভাল খেলে। কিন্তু গোল থেকে পাঁচ হাত দূরে ফাঁকায় যে দাঁড়িয়ে, সে যদি বলে যে, গোল করতে পারতুম কিনা কিছুই বলা যায় না, তাহলে আমি তাকে প্লেয়ার বলে মনে করব না।"

"পৃথিবীর বহু বড় প্লেয়ার একহাত দূর থেকেও তো গোল মিস করেছে।"

"করেছে কিনা জানি না, কিন্তু তারা কখনোই বলবে না—পাঁচ হাত দূরের থেকে গোল করতে পারব কিনা। এই 'কিনা' অর্থাৎ অনিশ্চয়তা, নিজের উপর অনাস্থা, কখনোই তাদের মুখ থেকে বেরোবে না। দুইকে দুই দিয়ে গুণ দিতে বললে, আপনার কি সন্দেহ থাকতে পারে, উত্তরটা চারের বদলে আর কিছু হবে?"

ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো বলে কমল লক্ষ্য করল, শ্রোতাদের মুখে অসুখী ছায়া পড়েছে।

"আপনার কথাগুলো একদিক দিয়ে ঠিক, তবে কি জানেন, যোগ-বিয়োগটা শিশুকাল থেকে করে করে শ্বাস-প্রশ্বাসের মত হয়ে যায়, আজীবন দুই দু-গুণে চারই বলব। কিন্তু ফুটবল খেলাটা তো তা নয়, একটা বয়সে রপ্ত করে আর একটা বয়সে ছেড়ে দিতেই হয়। যতবড় প্লেয়ারই হোক, একইভাবে সে খেলতে পারে না চিরকাল। আপনি যেভাবে একদিন চুনী কি প্রদীপ কি বলরামকে রুখতেন, পারবেন কি আজ সেইভাবে অনুপমকে আটকাতে?"

বক্তার বলার ভঙ্গিতে তেরছা বিদ্রূপ ছিল। কমলের রগ দুটো দপদপ করে উঠল। পিছন দিক থেকে কে মন্তব্য করল, "নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ!"

কমলের ইচ্ছে হলো ঘুরে একবার দেখে, কথাটা কে



পিছন দিক থেকে কে মন্তব্য করল, "নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহ!"

বলল। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, "শিক্ষায় যদি ফাঁকি না থাকে, তাহলে যে স্কিল মানুষ পরিশ্রম করে অর্জন করে তা কখনো সে হারায় না, বয়স বাড়লেও।"

"তার মানে, আপনি আগের মতই এখনো খেলতে পারেন ?"

"না। কিন্তু অনুপমদের আটকাবার মত খেলা বোধহয় এখনো খেলতে পারি।"

প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে তারপর সেটি অবিশ্বাস্যতা থেকে মজা পাওয়ায় রূপান্তরিত হলো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। কমলের মনে হলো সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

"বুড়োবয়সে ল্যাজে-গোবরে করে ছেড়ে দেবে।"

দাঁতে দাঁত চেপে কমল বলল, "যাত্রীর সঙ্গে লীগে শোভাবাজারের তো দেখা হবেই, তখন দেখা যাবে'খন।"

কমল যখন চারতলার হলঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে, শুনতে পেল কে চেঁচিয়ে বলছে, "ওরে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল। অনুপমকে জানিয়ে দিতে হবে।"

কমল নিজের সেকশনে আসামাত্রই রণেন দাস তাকে ডাকল, "এই যে, ছিলেন কোথায় এই দু'দিন ? ডুব মারবেন তো আগেভাগে বলে যেতে পারেন না ? লোক তো তিনজন অথচ কাজ থাকে বারোজনের। তার মধ্যে একজন কামাই করলে কি অবস্থাটা হয় ? এর উপর তিনটে বাজতে না বাজতেই তো প্লেয়ার হয়ে যাবেন।"

যে বিশ্রী মেজাজ নিয়ে কমল চারতলা থেকে নেমে এসেছে সেটা এখনো অটুট। তিক্তস্বরে সে বলল, "দরকার হয়েছিল বলেই ছুটি নিয়েছি। ছুটি নেবার অধিকারও আমার আছে।"

"অ। অধিকার আছে? রোজ তিনটের সময় বেরিয়ে যাওয়াটাও বুঝি অধিকারের মধ্যে!"

কমল জবাব দিল না। রণেন দাসকে সে একদমই পছন্দ করে না। লোকটা অর্ধেক সময় সীটে থাকে না। ক্যান্টিন অথবা ইউনিয়ন অফিস-ঘরে কিংবা চারতলা বা পাঁচতলায় গিয়ে পরচর্চায় সময় কাটায়, চুকলি কাটে আর ওভারটাইম রোজগারের তালে থাকে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে, তিরিশ বছর প্রায় চাকরি করছে, এগারোশো টাকা মাইনে পায়, কিন্তু সিগারেটটা পর্যন্ত চেয়ে খায়। রণেন দাস ডেসপ্যাচের কর্তা।

দুপুর দুটো নাগাদ গেমস্ সেক্রেটারি নতু সাহা খাতা হাতে কমলের কাছে হাজির হলো।

"কাল আপনাকে খুঁজে গেছি, আপনি আসেননি। আজ খেলা আছে বেঙ্গল টিউবের সঙ্গে ভবানীপুর মাঠে।" বলতে বলতে নতু সাহা খাতাটা খুলে এগিয়ে দিল। খাতায় টিমের খেলোয়াড়দের নাম লেখা। কমলের নামটি দু'জনের পরেই। সকলেরই সই আছে নামের পাশে।

প্রথমেই কমলের মনে পড়ল, আজ শোভাবাজারের খেলা আছে, তাকে খেলতেই হবে। কিন্তু সেকথা বললে নতু সাহা রেহাই দেবে না। রথীনের কথাগুলো মনে পড়ল—অফিসের দুটো খেলায় তুই খেলিসনি······এই নিয়ে কথা উঠেছে······ তোকে চাকরি দেওয়ায় ইউনিয়ন থেকে পর্যন্ত অপোজিশন এসেছিল······তোর জন্য এ জি এম পর্যন্ত ধরাধরি করেছি।

কমল খাতায় নিজের নামটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ভাবল; কি করি এখন। শোভাবাজারে আজ তাকে দরকার। সেখানকার টিমেও তার নাম আছে। ওই খেলারই

গুরুত্বটা বেশি, কিন্তু এই খেলাটা চাকরির জন্য। অবশ্য খেলব না বলে দেওয়া যায় নতু সাহাকে। তাহলে তিনটে-চারটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুবিধেটা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যাবে।

"কি হলো, সইটা করে দিন। একটু পরেই তো বেরোতে হবে।" অধৈর্য হয়ে নতু সাহা বলল।

"আমাকে আজ বাদ দেওয়া যায় না কি?"

"না না, আমাদের ডিফেন্সে আজ কেউ নেই। ফরোয়ার্ডে শুধু অনুপম। গোবিন্দ তো এক হপ্তার ছুটিতে গেছে, জহরের পায়ে চোট, আজ তো টিমই হচ্ছিল না।"

কমল আর কথা না বলে নিজের নামের পাশে সই করে দিল। সেই মুহূর্তে একবার সরোজের মুখটা সে দেখতে পেল—অসহায় এবং রাগে থমথমে।

॥ আট ॥

প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্কের ভ্যান ওদের চারটের সময় মাঠে পৌঁছে দিল। কমল লক্ষ্য করে, ভ্যানের এককোণে অনুপম বসে মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছিল, তাইতে ওর মনে হয়, নিশ্চয় কথাটা কানে গেছে। কমল অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। ড্রেস করে মাঠে নামতে গিয়ে সে দেখল, অনুপম ড্রেস করেনি। নতু সাহাকে কমল জিজ্ঞাসা করল, "অনুপম নামবে না ?"

"বলছে, দরকার হলে নামব। বড় প্লেয়ার, বুঝলেন না!" তির্যকস্বরে নতু সাহা বিরক্তি চাপতে চাপতে বলল, "কিছু বলাও যাবে না, সারা অফিস জুড়ে অমনি ভক্তরা হৈ হৈ করে উঠবে।"

কমল হাসল। তার মনে পড়ল, এমন মেজাজ একদিন সে-ও দেখিয়েছে।

হাফ-টাইমে প্রগ্রেসিভ ব্যাঙ্ক তিন গোলে হারছে। বেঙ্গল টিউব চারবার মাত্র বল এনেছিল, আর তাতেই তিনটি গোল! একমাত্র রাইট আউট আর সেন্টার ফরোয়ার্ডটিই যা কিছু খেলছে এবং তাদের গোলের দিকে এগোনোর পথ কমল অনায়াসেই বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তা সে করল না ইচ্ছা করেই। দু'বার সে ট্যাকল করতে গিয়ে কাঁচা খেলোয়াড়ের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর একবার হেড করতে উঠল দু'সেকেণ্ড দেরি করে। তাতেই গোল তিনটি

হয়ে যায়।

হাফ-টাইমে মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই কমলের চোখে পড়ল, অনুপম ড্রেস করে তার জনাচারেক ভক্তর সঙ্গে কথা বলছে। কমল মনে মনে হাসল। নন্তু সাহা বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে কমলকে বলল, "এভাবে গোল খাওয়ার মানে হয়? অ্যালেন লীগের প্লেয়ারও অমন করে চার্জ করে না, আপনি যা করলেন।"

কমল কথা না বলে ঘাসের উপর বসে পড়ে লিমনেডের একটা বোতল তুলে নিল।

"লোকে যে কেন আপনাকে বড় প্লেয়ার বলতো বুঝি না!"

মুখ থেকে বোতলটা নামিয়ে কমল হেসে নিচু গলায় বলল, "আর গোল হবে না। আপনারা যাকে বড় প্লেয়ার বলেন, তাকে এবার গোল শোধ করতে বলুন।"

"সেজন্য ভাবছি না। অনুপম খানপাঁচেক অনায়াসেই চাপিয়ে দেবে। কিন্তু দোহাই আর গোল খাওয়াবেন না।"

কমল খালি বোতলটা রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে বেঙ্গল টিউবের খেলোয়াড়রা বসে জিরোচ্ছে। কমল লক্ষ্য করেছে, ওদের লেফট-হাফ বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা ছেলেটি এলোপাতাড়ি পা চালায়, পাস দিতে গিয়ে কেমন গোলমাল করে ফেলে, বিন্দুমাত্র কণ্ট্রোল নেই বলের উপর কিন্তু প্রচণ্ড দম আর বেপরোয়া গোঁয়ার্তুমিটা আছে। যার ফলে যেখানে বল সেখানেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতোতে ছুটছে। বল ধরতে গিয়েও ওকে দেখে অনেকেই বল ছেড়ে সরে যাচ্ছে।

কমল ওর কাছে গিয়ে বলল, "দারুণ খেলছো তো। প্রগ্রেসিভকে তো দেখছি তুমি একাই রুখে দিয়েছ।"

আনন্দে এবং লজ্জায় ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগল কমল গুহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়।

"তবে এবার তোমার কপালে দুঃখু আছে।"

সচকিত হয়ে ছেলেটি বলল, "কেন, কেন?"

"এবার অনুপম নামছে। ও বলেছে—পাঁচখানা চাপাবো বেঙ্গল টিউব আবার টিম নাকি?"

কমল লক্ষ্য করল, ছেলেটির মুখ রাগে থমথমে হয়ে উঠল।

"দেখি তুমি কত ভাল প্লেয়ার, এইবার বুঝব।" এই বলে কমল সরে এল।

খেলা আবার শুরু হয়ে বল মাঝ-মাঠেই রইল মিনিট পাঁচেক। অনুপম কোমরে হাত দিয়ে ডান টাচ্ লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে এল বলের আশায়।

বল পেল অনুপম। কাটাল একজনকে, পরের লোক-টাকেও। কমল দেখল টিউবের লেফট হাফ প্রায় চল্লিশ গজ থেকে ছুটে আসছে। সামনে তিন ডিফেণ্ডার। অনুপম বল থামিয়ে দেখছে কাকে দেওয়া যায়। চোখে পড়ল বুলডোজারের মত আসছে লেফট হাফ। অনুপম তাড়াতাড়ি বলটা নিজেদের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ব্রেক কষতে কষতে ১৫ গজ এগিয়ে গেল এবং তারপরই ঘুরে আবার বলের দিকে তাড়া করল।

অনুপমের দেওয়া বল সেণ্টার ফরোয়ার্ড রাখতে পারেনি। বল এল কমলের পায়ে। অবহেলায় সে ছোট্ট জায়গার মধ্যে পাঁচ-ছয়বার কাটিয়ে নিতে নিতে দেখে নিল অনুপম ও তার প্রহরী লেফট হাফটি কোথায়। তারপর



সবাই দেখল, অনুপম বল ধরতে পারল না...

অনবদ্যভাবে ঠিক দু'জনের মাঝ বরাবর বলটা ঠেলে দিল, যাতে ছুটে গিয়ে অনুপমকে পাসটা ধরতে হয়।

অনুপম ছুটে গিয়ে বলে পা দিতে যাবে, তখন আর একটি পা সেখানে পৌঁছে গেছে। টায়ার ফাটার মত চার্জের শব্দ হলো। বলটা ছিটকে এল প্রগ্রেসিভের হাফ লাইনে। পর পর তিনবার কমল থ্রু দিল অনুপমকে, অবশ্যই লেফট হাফের দিকে ঘেঁষে। সবাই দেখল, অনুপম বল ধরতে পারল না বা ছুটেও থমকে পড়ল। রাইট উইং থেকে সে লেফট উইংয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লেফট-হাফও ডানদিকে চলে এল। মাঠের বাইরে মুখ টিপে অনেকে হাসল। কমল দেখল, অনুপমের মুখে রাগ, বিরক্তি ও হতাশা।

আবার অনুপমকে বল বাড়ালো কমল। টিউব যেন জেনে গেছে সব বল অনুপমকেই দেওয়া হবে। তিনজন ওর উপর নজর রেখে ওর কাছাকাছি ঘুরছে। অনুপম বলটা ধরার জন্য এক হাতও এগোল না। বরং দু'হাত নেড়ে চীৎকার করতে করতে সে কমলের কাছে এসে বলল, "আমাকে কেন, আমাকে কেন। বল দেবার জন্য আর কি মাঠে লোক নেই?"

অবাক হয়ে কমল বলল, "সে কি, অফিসে শুনলুম, কাল প্রসূন বল দেয়নি বলে তুমি তিনটের বেশি গোল পাওনি!"

অনুপম আর কথা বলেনি। মাঠের মধ্যে সে ছোটাছুটি শুরু করল, লেফট-হাফের পাহারা থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তার তখন একমাত্র চিন্তা—চোট যেন না লাগে। এর পরই কমল বল নিয়ে উঠল। এগোতে এগোতে টিউবের পেনাল্টি এরিয়ার কাছে পৌঁছে অনুপমকে বল দেবার জন্য তার দিকে ফিরে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে একজনকে কাটিয়েই প্রায় ১৬ গজ

থেকে গোলে শট নিল। টিউবের কেউ ভাবতে পারেনি, অনুপমকে বল না দিয়ে কমল নিজেই আচমকা গোলে মারবে। বল যখন ডান পোস্টের গা ঘেঁষে গোলে ঢুকছে, গোলকীপার তখনো অনুপমের দিকে তাকিয়ে বাঁ পোস্টের কাছে দাঁড়ানো।

তিন মিনিট পরে ঠিক একইভাবে কমল আবার গোল দিল। টিউব এবার অনুপমকে ছেড়ে কমল সম্পর্কে সজাগ হয়ে পড়ল। খেলা শেষ হতে চার মিনিট বাকি, রেজাল্ট তখন ৩—১। প্রগ্রেসিভ হারছে। কমল বল নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল। তিন জনকে কাটিয়ে সে বল দিল রাইট-ইনকে। সে আবার ফিরিয়ে দিল কমলকে। অনুপমের প্রহরী তেড়ে আসছে। কমল বলটা পায়ে রেখে অপেক্ষা করল এবং শেষ মুহূর্তে নিমেষে বল নিয়ে সরে দাঁড়াল। লেফট হাফ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার তেড়ে এল। কমল আবার একইভাবে সরে গেল। তিনবার এই দৃশ্য ঘটতেই টিউবের দু'জন খেলোয়াড় এগিয়ে এল। কমল ডান পায়ে বল মারার ভঙ্গি করে চেঁচিয়ে উঠল, "অনুপম!"

অনুপম বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গেল বলের আশায়। তার সঙ্গে গেল টিউবের তিনজন। কমল বাঁ পায়ে বলটা ঠেলে দিল দুজন ডিভেণ্ডারের মাঝ দিয়ে পেনাল্টি বক্সের মাঝখানে। আর রাইট-ইন, যে বল সে একশোটার মধ্যে আটানব্বইটা গোলের বাইরে মারবে, সেই বল গোলে পাঠিয়ে দিল।

খেলা শেষে নতু সাহা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল কমলের দিকে। কমল থমকে দাঁড়িয়ে অনুপমকে বলল, "পাস কখন দেবে, কেন দেবে এবং দেবে না, সেটা প্রসূন জানে। বল পেয়ে খেলা যেমন, না পেয়েও তেমন একটা খেলা আছে।

সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

অনুপমের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে নন্তু সাহার হাতটা সরিয়ে কমল টেণ্টের দিকে এগিয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে সে ট্রামে শুনল, শোভাবাজার তিন গোলে রাজস্থানের কাছে হেরেছে।

॥ নয় ॥

পরদিন অফিসে পৌঁছনমাত্র কমল শুনল, রথীন তাকে দেখা করতে বলেছে।

ওর চেম্বারে ঢুকতেই রথীন টেলিফোনে কথা বলতে বলতে ইশারায় কমলকে বসতে বলল।

"তারপর," রথীন টেলিফোন রেখে বলল, "কাল নাকি দারুণ খেলেছিস!"

"কে বলল!" কমল ভাবতে শুরু করল, রথীনকে এর মধ্যেই কে খবর দিতে পারে!

"যেই বলুক না। তিন গোল খাইয়ে অনুপমকে মাঠে নামিয়েছিস, এমন থ্রু বাড়িয়েছিস যাতে না ও ধরতে পারে, তারপর গোল দিয়ে মান বাঁচিয়েছিস। সাবাস, অসাধারণ! এক ঢিলে তিন পাখি একেই বলে।"

কমল কথা না বলে ফিকে হাসল। রথীনের মুখ থমথম করছে।

"একজন সিনিয়ার প্লেয়ার জুনিয়ারকে মাঠের মাঝে অপদস্থ করবে ভাবা যায় না। আনস্পোরটিং।"

কমল শক্ খেয়ে সিধে হয়ে বসল। রাগটা কয়েকবার দপদপ করে উঠল চোখের চাউনিতে।

"ব্যাপারটা কি? অনুপম তোর ক্লাবের প্লেয়ার বলেই কি আমি আনস্পোরটিং?"

"আমার ক্লাব বলে কোন কথা নয়। একটা উঠতি

প্রমিসিং ছেলে, তাকে হাস্যকর করে তুললে সাইকোলজিক্যালি তার একটা সেটব্যাক হয়। এ বছর যাত্রীর ফরোয়ার্ড লাইনে অনুপম অত্যন্ত ইম্পর্টান্ট রোল প্লে করছে। যাত্রী শিল্ড পেয়েছে কিন্তু লীগ পায়নি কখনো। আমার আমলে যাত্রীকে আমি লীগ এনে দেবো। 'এ বছর নিখুঁত যন্ত্রের মত যাত্রী খেলছে। আমি চাই না এর সামান্য একটা পার্টসও বিগড়ে যাক। আমি তা হতে দেবো না।"

রথীনের মুঠো করা হাতটার দিকে কমল তাকাল। হিংস্র আঘাতের জন্য মুঠোটা তৈরী। কমল নির্লিপ্তস্বরে বলল, "আমি কি এবার উঠতে পারি?"

কঠিন চোখে রথীন তাকাল। কমলও।

"আমার কথাটা আশা করি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি।"

কমল ঘাড় নাড়ল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "একশো টাকাটা এখনো শোধ দিতে পারিনি, হাতে একদমই টাকা নেই। সামনের মাসে মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।"

"না দিলেও চলবে। একশো টাকার জন্য যাত্রী মরে যাবে না।"

"কত টাকার জন্য তাহলে মরতে পারে?"

"মানে!"

"পাঁচ হাজার?"

রথীনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। কমল সেটা লক্ষ্য করে বলল, "আমার মনে হয় না যুগের যাত্রী খুব একটা স্পোরটিং ক্লাব।"

"এখন তুমি যেতে পার।" রথীন দরজার দিকে আঙুল তুলল।

কমল নিজের চেয়ারে এসে বসা মাত্র বিপুল ঘোষ ফিস-ফিস করে বলল, "কাল কি রকম খেলেছেন মশাই, অফিসের ছোকরারা খাপ্পা হয়ে গেছে। আপনি নাকি খুব বড় একজন প্লেয়ারকে খেলতে না দিয়ে একাই খেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় প্লেয়ার সে?"

"মস্ত বড়। আট হাজার টাকা নাকি পায়।"

"আ—ট! বলেন কি মশাই, সাত ঘণ্টা চোদ্দ বছর ধরে কলম পিষে আজ পাচ্ছি বছরে আট হাজার। আর এরা একটা বলকে লাথি মেরে পাচ্ছে আট হাজার টাকা! তার সঙ্গে চাকরির টাকাটাও ধরুন।"

"পাক না টাকা। ভালই তো। কলম পেষার থেকে ফুটবল খেলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।"

কমল আলোচনা বন্ধের জন্য চিঠির গোছা সাজাতে শুরু করল। এগুলোর কুষ্ঠি-ঠিকুজি এখন খাতায় এন্ট্রি করতে হবে। তারপর খামে ভরে দপ্তরির কাছে পাঠানো স্ট্যাম্প দিয়ে ডাকে পাঠাবার জন্য। ভুল হয়ে গেলে একের চিঠি অন্যের কাছে চলে যাবে। চাকরি নিয়ে তখন টানাটানি পড়বে।

রণেন সাহা এতক্ষণ একমনে কাজ করছিল। মাথা না তুলে এবার বলল, "আজও তিনটের সময় চলে যাবেন নাকি?"

"কেন!" কমল বলল।

"কাল যে দুটো গোল করেছেন।"

কমল হেসে উঠল।

ছুটির কিছু আগে ফোন এল কমলের। অরুণার গলা:

"কমলদা, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বেলেঘাটায় একটা স্কুলে টিচার নেওয়া হচ্ছে। তোমাদের ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেবে? উনি ঐ স্কুলের কমিটিতে আছেন। যদি চাকরিটা পাই, তা হলে এখন যেটা করি সেটা বরুণাকে দিয়ে দেবো।"

কমল ওকে জানাল, ক্লাবে গিয়ে কেষ্টদার সঙ্গে সে আজকেই কথা বলবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে কমল হেঁটেই ময়দানে যায়। আজ যাবার পথে সারাক্ষণ রথীনের কথাগুলো, তার আচরণের পরিবর্তন এবং সব থেকে বেশি 'আনস্পোরটিং' শব্দটি কমলের মাথার মধ্যে ঠকঠক করে আঘাত করতে লাগল।

"এই যে। আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম। দেখা হয়ে ভালই হল।"

চমকে উঠে কমল দেখল, সাংবাদিকটি সামনে দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, "কেন?"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আপনি কি রিটায়ার করেছেন?"

"সে কি! কোথায় শুনলেন?"

"কাল যুগের যাত্রীর টেন্টে গেছলুম। সেখানে প্রতাপ ভাদুড়ী বলল আপনি নাকি রিটায়ার করেছেন।"

চলতে চলতে কমল বলল, "আচ্ছা, তাই নাকি! আর কি শুনলেন?"

"যাত্রীর কে যেন কাল অফিস লীগে আপনার খেলা দেখতে গিয়েছিল। তার সঙ্গেই আলোচনা করছিল প্রতাপ ভাদুড়ী। আপনি অনুপমকে নাজেহাল করেছেন শুনে বলল, কমল তো শুনেছি রিটায়ার করে গেছে। ওকে কিছু টাকা

বেনিফিট হিসাবে দেবো ভাবছি, অনেক বছর যাত্রীতে খেলে গেছে তো।"

"কত টাকা দেবে কিছু বলেছে ?"

"না।"

"শোভাবাজারের পরের ম্যাচেই আমি খেলছি।"

"তা হলে রিটায়ার করেননি !"

কমল জবাব না দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল বিস্মিত সাংবাদিককে ভীড়ের মধ্যে ফেলে রেখে।

শোভাবাজার টেণ্টে ঢোকার মুখেই কমলের সঙ্গে দেখা হল সত্য আর বলাইয়ের।

"কাল আপনি এলেন না কমলদা ? খেলা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত সরোজদা আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে।"

"অফিস আটকে দিল।" কমল অপ্রতিভ হয়ে বলল। "খেললি কেমন তোরা ?"

বলাই হেসে বলল, "আর খেলা ! আপনার জায়গায় স্বপনকে নামানো হয়েছিল। তিনটে গোল ওই খাওয়াল।"

"লাস্ট গোলটা, বুঝলেন কমলদা, যদি দেখতেন তো হাসতে হাসতে মরে যেতেন। ওদের শ্যামল বোস ছুটো গোল করেছে। রাইট আউট বল নিয়ে এগোচ্ছে। স্বপন ট্যাকল করতে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে শ্যামল বোসের কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল। ওদিকে রাইট আউট ফাঁকা এগিয়ে এসে গোল করে দিল। আমরা তো অবাক। বললুম—স্বপন, তুই ওভাবে ছেড়ে দিয়ে এদিকে দৌড়ে এলি কেন ? কি বলল জানেন ! যদি শ্যামল বোসকে বল দিত আর যদি শ্যামল বোস গোল

করত তাহলে ওর হ্যাটট্রিক হয়ে যেত না ?"

বলতে বলতে সত্য হো হো করে হেসে উঠল। বলাইও। "বুঝলেন কমলদা, উফ্‌ফ্‌, স্বপন হ্যাটট্রিক করতে দেয়নি। ওহঃ, গোল খাও, পরোয়া নেহি, হ্যাটট্রিক হোনে নেহি দেগা।"

কমলও হাসল। তারপর চোখে পড়ল, ভরত টেন্টের মধ্যে চেয়ারে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে। কমল এগিয়ে এসে বলল, "সরি ভরত।"

"আপনি থাকলে কাল গোল খেতুম না।"

"কি করব, অফিসের খেলা ফেলে আসতে পারলুম না।"

"কমলদা, শোভাবাজারে ন'বছর আছি। ফার্স্ট গোলি সাত বছর ধরে। এমন জঘন্য টিম কোনো বার দেখিনি। থার্ড ডিভিশনেও এরা খেলার যোগ্য নয়। না আছে স্কিল না আছে ফুটবল সেন্স। পারে শুধু গালাগালি আর লাথি চালাতে। বলাই, সত্য, শ্রীধর তিনজনকেই রেফারী ওয়ার্ন করেছে। স্বপন যতই বোকামি করুক, প্রাণ দিয়ে খেলেছে ওর সাধ্য মত।"

"নেক্‌স্ট ম্যাচ কার সঙ্গে ? বাটা ?"

"হ্যাঁ।"

সেক্রেটারির ঘর থেকে এই সময় সরোজ বেরোল। কমলকে দেখেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ।

"আসতে পারলাম না সরোজ।"

"জানি, অফিসের হয়ে খেলেছেন।"

"পরের ম্যাচে অবশ্যই খেলব। তাতে চাকরি যায় যাবে।"

"সরি কমলদা, টিম হয়ে গেছে। স্বপনই খেলবে।"

"সরোজ, আমি রিটায়ার করেছি বলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। ওটা মিথ্যা রটনা প্রমাণ করতে আমাকে নামতেই হবে মাঠে।"

"টিম আর বদলান যাবে না।" সরোজ স্বরে কাঠিন্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অন্য ম্যাচে খেলবেন।"

শোভাবাজারের মত নগণ্য টিমের অতি নবীন কোচ যে এভাবে তার সঙ্গে কথা বলবে, কমলের তা কল্পনার বাইরে। কথা না বাড়িয়ে সে সেক্রেটারির ঘরে ঢুকল।

কৃষ্ণ মাইতি বাড়িতে তিন-চার টাকার বেশি বাজার করেন না। বাইরে লুকিয়ে রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য উদরস্থ করাই তার জীবনের একমাত্র শখ। আস্ত চিকেন রোস্ট নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলেন। যখন কমল সামনে এসে বসল, কথা না বলে একবার তাকালেন শুধু তিনি।

"সামনের ম্যাচ বাটার সঙ্গে। কেষ্টদা, আমি খেলতে চাই।"

"বেশ তো, নিশ্চয় খেলবি।"

"সরোজ টিমে আমার নাম রাখেনি।"

"সে কি!" কৃষ্ণ মাইতি চীৎকার করে উঠলেন, "সরোজ, সরোজ!"

সরোজ ঘরে ঢোকা মাত্র বললেন, "কমল বাটা ম্যাচ খেলবে।"

"কিন্তু—" সরোজ কড়া চোখে কমলের দিকে তাকাল।

"কিন্তু-টিন্তু নয়। কমল কলকাতা মাঠের সব থেকে সিনিয়ার প্লেয়ার। বড় বড় টিম এখনো মাঠে ওকে দেখলে ভয়ে কাঁপে। ও খেলতে চেয়েছে, খেলবে।"

"কিন্তু কেষ্টদা, আমি টিমটা অনেক ভেবেই করেছি একটা

বিশেষ প্যাটার্নে খেলাব বলে। তা ছাড়া কমলদা তো একদিনও প্র্যাকটিস করলেন না ছেলেদের সঙ্গে।"

"প্র্যাকটিস!" কেষ্টদা দারুণ বিষম খেলেন। কয়েকবার ব্রহ্মতালু থাবড়ে নিয়ে ধাতস্থ হয়ে বললেন, "প্যাটার্ন, প্র্যাকটিস সব হবে, সব হবে। যা বললুম তাই করো। কমল খেলবে।"

"আচ্ছা।"

সরোজ বেরিয়ে যাবার সময় কঠিন দৃষ্টি হেনে গেল কমলের দিকে।

"বুঝলে কমল, বাবুরা কোচিং করে ক্লাবকে উদ্ধার করবে। শেষ দিকে পয়েন্ট ম্যানেজ করে তো রেলিগেশন থেকে বাঁচতে হবে। ওঠা-নামা যদ্দিন বন্ধ ছিল, বুঝলে, শান্তিতে ছিলুম।"

"কেষ্টদা, আপনি যে মেয়েদের স্কুলের কমিটি মেম্বার, সেখানে টিচার নেওয়া হচ্ছে। আমার একজন পরিচিত অ্যাপ্লাই করেছে। আপনি একটু দেখবেন?"

"কে হয় তোর?"

"পল্টু মুখার্জির বড় মেয়ে।"

ভ্রূ কুঁচকে কৃষ্ণ মাইতি আঙুলে লেগে থাকা ঝোল চাটতে চাটতে কি যেন ভাবল। তারপর বল্ল, "আচ্ছা দেখব'খন। কিন্তু তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। যুগের যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলা সতেরোই। পয়েন্ট নিতে হবে। যদি নিতে পারিস, তা হলে চাকরিটা হবে।"

কমল অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চাকরি দেবার এরকম অদ্ভুত সর্তের কারণ সে বুঝতে পারছে না।



পয়েন্ট দে, আমিও তা হলে চেষ্টা করব।

"কেষ্টদা, তা কি করে হয়!"

"হতেই হবে। পয়েন্ট দে, আমিও তা হলে চেষ্টা করব। গুলোকে আমি একবার দেখে নেব। গত বছর কথা ছিল, ম্যাচ ছেড়ে দিলে আর গভর্নিং বডির মিটিংয়ে কালিঘাটের সঙ্গে গণ্ডগোলে বন্ধ হয়ে যাওয়া খেলাটা রি-প্লে হওয়ার পক্ষে ভোট দিলে সাতশো টাকা দেবে টেন্ট সারাতে। ম্যাচ ছাড়ার আর দরকার হয়নি, এমনিতেই যাত্রী চার গোল দিয়েছে। ভোট দিয়েছিলুম কিন্তু যাত্রী জিততে পারেনি। ব্যাস, ব্যাটা আর টাকা ঠেকাল না। যদি পারিস ফার্স্ট ম্যাচে পয়েন্ট নিতে তা হলে ভয় খাবে, রিটার্ন লীগ ম্যাচে সুদে-আসলে তখন কান মলে আদায় করে নেব। পল্টু মুখুজ্যের মেয়ের চাকরি, কমল এখন তোর হাতে।"

কমল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইল চশমার পিছনে পিটপিটে দুটো চোখের দিকে। যাত্রীকে পয়েন্ট থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছাটা তারও প্রবল। কিন্তু কৃষ্ণ মাইতির ইচ্ছাটার সঙ্গে তারটির কি ভীষণ অমিল। সব থেকে অস্বস্তিকর ও ভয়ের ব্যাপার এই সর্তটা। যাত্রীর কাছ থেকে পয়েন্ট নেওয়া একার সাধ্যে সম্ভব নয়। বয়স হয়েছে, দমে কুলোয় না। এজিলিটি কমে গেছে, স্পীডও। শুধু অভিজ্ঞতা সম্বল করে একটা তাজা দলের সঙ্গে একা লড়াই করা যায় না। তার থেকেও বড় কথা, অরুণার চাকরি পাওয়া যদি যাত্রীর সঙ্গে খেলার ফলের উপর নির্ভর করে, তবে সেটা একটা বাড়তি চাপ হবে মনের উপর।

কমলের মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক বৃদ্ধের ছবি। কি যেন বলছেন, কমল মন দিয়ে শোনার চেষ্টা

করল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, "ব্যালান্স! হ্যাঁ পল্টুদা, ব্যালান্স রাখতে হবে।"

"ব্যালান্স কি রে, পয়েন্ট চাই।"

কমল উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, "আমি চেষ্টা করব।"

॥ দশ ॥

কিক্ অফের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কমলের শরীরে হালকা একটা কাঁপন লাগল। গত বছর আই এফ এ শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডে এই মহমেডান মাঠেই শেষবার খেলেছে। তারপর ঘেরা মাঠে আজ প্রথম। প্রত্যেকবার, গত কুড়ি বছরই, কিক্ অফের বাঁশি শুনলেই তার শরীর মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে। স্নায়ুগুলো নাড়াচাড়া খেয়ে আবার ঠিক হয়ে যায়। তারপর প্রত্যেকটা কোষ ফেটে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে উঠতে শুরু করে।

কমল অনুভব করল আজকেও সে তৈরী। বাটা আলস্যভরে খেলা শুরু করেছে। বল নিয়ে ওরা মাঝখান দিয়ে ঢুকছিল, রাইট হাফ সত্য চার্জ করে বলটা লম্বা শটে ডান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে পাঠিয়ে দিল। কমল বিরক্ত হল। অযথা বোকার মত বলটা নষ্ট করল। রাইট উইং রুদ্র তখন সেণ্টার ফ্ল্যাগের কাছে, তার পক্ষে ওই বল ধরা সম্ভব নয়। তবু রুদ্র দৌড়িয়ে খানিকটা দম খরচ করল।

পেনাল্টি এরিয়ার ১৮×৪৪ গজ জায়গা নিয়ে কমল খেলতে থাকে। দু'বার তাকে বল নিয়ে আগুয়ান ফরোয়ার্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে হয়েছে এবং দু'বারই বল দখল করেছে। নির্ভুল বল দিয়েছে ফরোয়ার্ডদের, কাঁচা ছেলে স্বপন নিজের জায়গা ছেড়ে বলের পিছনে যত্রতত্র ছুটছে, তাকে কোথায়

পজিশন নিতে হবে বার বার চেঁচিয়ে বলছে, বল নিয়ে ওঠার মত ফাঁকা জমি পেয়েও সে প্রলোভন সামলেছে। খেলা পনেরো মিনিটে গড়াবার আগেই কমল নিজের সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে উঠল।

সবুজ গ্যালারিতে দুটি মাত্র লোক। হাওড়া ইউনিয়নের মেম্বার গ্যালারিতে জনা পনেরো লোক। ওরা রোজই আসে, খেলার পরও সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। মহমেডান মেম্বার গ্যালারিতেও কিছু লোক। খেলা চলছে উদ্দেশ্যবিহীন, মাঝ মাঠে। কিন্তু এরই মধ্যে কমল লক্ষ্য করল, শোভাবাজারের তিন-চারজনের যেন খেলার ইচ্ছাটা একদমই নেই। বিপক্ষের পায়ে বল থাকলে চ্যালেঞ্জ করতে এগোয় না, ট্যাকল করতে পা বাড়ায় না, বল নিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলে তাড়া করে না। কমল ক্রমশ অনুভব করতে লাগল যে, তার উপর চাপ পড়ছে। মাঝমাঠে যে বাঁধটা রয়েছে তাতে একটার পর একটা ছিদ্র দেখা দিচ্ছে আর অবিরাম বল নিয়ে বাঁটা এগিয়ে আসছে।

কিন্তু অবাক হল কমল, রাইট ব্যাকে স্বপনের খেলা দেখে। যেখানে বল সেখানেই স্বপন। এলোপাথাড়ি পা চালিয়ে, ঝাঁপিয়ে, লাফিয়ে সে নিজেকে হাস্যকর করে তুললেও, কমল বুঝতে পারছে, ওর এইভাবে খেলাটা ফল দিচ্ছে। নিজের জায়গা ছেড়ে ছোটাছুটি করলেও কমল ওকে আর নিষেধ করল না। তবে ডান দিকের বিরাট ফাঁকা জায়গাটা বিপজ্জনক হয়ে রইল।

হাফ-টাইমের পর প্রথম মিনিটেই শোভাবাজার গোল-কিক পেয়েছে। ভরত বলটা গোল এরিয়ার মাথায় বসাবার সময় কমলকে বলল, "সত্য, শম্ভু, বলাই মনে হচ্ছে বেগোড়বাই

শুরু করেছে। কমলদা, আপনি রুদ্রকে নেমে এসে ডান-দিকটা দেখতে বলুন।"

কমল কিক করার আগে শুধু বলল, "আর একটু দেখি।"

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই বাটা পেনাল্টি কিক পেল। লেফট ব্যাক বলাই অযথা দু'হাতে বলটা ধরল, যেটা না ধরলে ভরত অনায়াসেই ধরে নিত। ভরত তাজ্জব হয়ে বলল, "এটা তুই কি করলি?"

বলাই মাথায় হাত দিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "একদম বুঝতে পারিনি। ভাবলুম তুই বোধহয় পজিশনে নেই, বলটা গোলে ঢুকে যাবে।"

ভরত বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে গোলে দাঁড়াল এবং পেনাল্টি কিক হবার পর গোলের মধ্য থেকে বলটা বার করে প্রবল বিরক্তিতে মাটিতে আছাড় মারল।

"বলাই!" গম্ভীর স্বরে কমল বলল, "তুমি রাইট উইংয়ে যাও। আর রুদ্র, তুমি নেমে এসে খেলো।"

বলাই উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করল, "কেন? আমি পজিশান ছেড়ে খেলব কেন?"

"আমি বলছি খেলবে।"

"আপনি অর্ডার দেবার কে? ক্যাপ্টেন দেবীদাস কিংবা কোচ সরোজদা ছাড়া হুকুম দেবার অধিকার কারুর নেই।"

কমল চুপ করে সরে গেল। সত্য চেঁচিয়ে বলাইকে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছে রে?"

রাগে অপমানে ঝাঁঝিয়ে উঠল কমলের মাথা। শুধুমাত্র স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে দু'পাশে নিয়ে সে লড়াই শুরু করল। রুদ্র নেমে এসে খেলছে। এখন বাটাকে গোল দেবার কোন

কথাই ওঠে না। শোভাবাজার গোল না খাওয়ার জন্য লড়ছে সাত-আটজনকে সম্বল করে।

পঞ্চাশ মিনিটের পর থেকেই শোভাবাজার ডিফেন্স ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল। সত্য, শম্ভু, বলাই অযথা ফাউল করছে। তিনটে ফ্রি কিকের দুটি ভরত দুর্দান্ত-ভাবে আটকেছে, অন্যটি ফিস্ট করে কর্নার করেছে। কমল দাঁতে-দাঁত চেপে পেনাল্টি এরিয়ার ফোকরগুলো ভরাট করে চলেছে আর চীৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে স্বপন আর প্রাণবন্ধুকে। বাটার ছয়জন, কখনো আটজন আক্রমণে উঠে আসছে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো তিনটি গোল তারা দিল।

"কমলদা, আর আমি পারছি না।" হাঁফাতে হাঁফাতে স্বপন বলল।

ছেলেটার জন্য কষ্ট হচ্ছে কমলের। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার বা ওকে ঢিলে দিতে বলার সময় এখন নয়। চার গোল খেয়েছে শোভাবাজার। বাটার দুজনের জন্য তাদের একজন। সংখ্যার অসমত্ব নিয়ে লড়াই অসম্ভব। খেলাটা এখন এলোপাথাড়ি পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাটা গোল না দিয়ে শোভাবাজারকে নিয়ে এখন ছেলেখেলা করছে।

"তোর থেকে আমার ডবল বয়েস। আমি পারছি, তুই পারবি না কেন?"

স্বপন ঘোলাটে চোখে কমলের দিকে তাকিয়ে মাথাটা দু'বার ঝাঁকিয়ে আবার বলের দিকে ছুটে গেল। কমলের মনে হল, যদি এখন সলিলটাও পাশে থাকত। প্রাণবন্ধু, স্বপন এবং রুদ্রও এখন পেনাল্টি এরিয়ায় নেমে এসে খেলছে। ফরোয়ার্ডরা—দেবীদাস, গোপাল, শ্রীধর হাফ লাইনে নেমে

এসেছে। বাটার গোলকীপার পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। কমল কখনো যা করতে চায় না, যা করতে সে ঘৃণা বোধ করে, তাই শুরু করল। সময় নষ্ট করে কাটাবার জন্য, বল পাওয়া মাত্র গ্যালারিতে পাঠাতে লাগল। গ্যালারীতে লোক নেই, বল কুড়িয়ে আনতে সময় লাগে।

চার গোলেই শোভাবাজার হারল। খেলার শেষে মাঠের বাইরে এসেই স্বপন আছড়ে পড়ল। কমল এক গ্লাস জল মাথায় ঢেলে শুধু একবার সরোজের দিকে তাকাল। সরোজ মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলাই হাসতে হাসতে সরোজকে বলল, "শুধু চিকেন চৌ-মিনে হবে না বলে রাখছি, এক প্লেট করে চিলি চিকেনও।"

কমল ঝুঁকে স্বপনের হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। গতি অসম্ভব দ্রুত। মনে হল মিনিটে দেড়শোর উপর। ওর পাশে উবু হয়ে বসা রুদ্র আর প্রাণবন্ধুর দিকে তাকিয়ে কমল ম্লান হেসে বলল, "রেস্ট নিক আর একটু। পরশু থেকে তোদের নিয়ে প্র্যাকটিসে নামব।"

টেন্টে এসে স্নান করে কমল যখন ড্রেসিং রুমে পোশাক পরছে, তখন শুনতে পেল বাইরে ক্লাবের দুই একজিকিউটিভ মেম্বার বলাবলি করছে :

"সরোজ তো তখনই বলেছিল, চলে না, বুড়ো ঘোড়া দিয়ে আর চলে না। মডার্ন ফুটবল খেলতে হলে খাটুনি কত!"

"কেষ্টদার যে কি দুর্বলতা ওর উপর, বুঝি না। ইয়াং ছেলেরা চান্স না পেলে টিম তৈরী হবে কি করে, কোচ রাখারই বা মানে কি? পাওয়ার ফুটবল এখন পৃথিবীর সব জায়গায় আর আমরা—"

"সরোজ বলছে, এভাবে তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সে

আর দায়িত্ব নিতে পারবে না।"

"কেষ্টদার উপর তো আর এখানে কথা চলে না, ডুবলো, ক্লাবটা ডুবলো।"

কমল ঘর থেকে বেরোতেই ওরা চুপ করে ভ্যাবাচাকার মত তাকিয়ে রইল। তারপর একজন তাড়াতাড়ি বলল, "অ্যাঁ, তা হলে চার গোল হল!"

"হ্যাঁ, চার গোল।" কমল গম্ভীরস্বরে জবাব দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। টেন্টের বাইরে এসে দেখল, ক্যান্টিনের কাউন্টারে সরোজ চা খাচ্ছে। ওকে ডাকতে গিয়ে কমল ইতস্তত করল। কয়েকটা কথা এখন তার সরোজকে বলতে ইচ্ছে করছে। তারপর ভাবল, থাক, তর্কাতর্কি করে ভীড় জমিয়ে লাভ নেই। কমল বেরিয়ে এল ক্লাব থেকে।

বাসে দমবন্ধ ভীড়ে কমল মাথার উপরের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই মাঝবয়সী একটি লোক বার বার তার দিকে তাকাতে তাকাতে অবশেষে বলল, "আজ খেলা ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কি রেজাল্ট হল?"

বুকের মধ্যে ডজনখানেক ছুঁচ ফোটার ব্যথা কমল অনুভব করল। ভাবল, না শোনার ভান করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু লোকটির প্রত্যাশাভরা মুখটি অগ্রাহ্য করতে পারল না। আস্তে বলল, "ফোর নীল।" তারপর বলল, "হেরে গেছি।"

লক্ষ্য করল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। কমলের দিকে আর মুখ ফেরাল না। মুঠোর মধ্যে হাতলটা

দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলতে চাইল কমল। হয়তো এই লোকটি তার দশ কি বারো বছর আগের খেলা দেখেছে। তারপর নানান কাজে জড়িয়ে পড়ে আর মাঠে যায় না। কিন্তু মনে করে রেখেছে কমল গুহর খেলা। হয়তো একদিন এই লোকটিও তাকে কাঁধে তুলে মাঠ থেকে টেন্টে বয়ে নিয়ে গেছে খেলার পর।

ভাবতে ভাবতে কমল নিজের উপরই রাগে ক্ষোভে আর অদ্ভুত এক অপমানের জ্বালায় ছটফট করে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরল।

পরদিন অফিসে নিজের চেয়ারে বসতেই চোখে পড়ল, খড়ি দিয়ে তার টেবলে বড় বড় অক্ষরে লেখা: "৪—০। এবং যুগের যাত্রীর সঙ্গেও এই রেজাল্ট হবে।"

কমল কিছুক্ষণ টেবলের দিকে তাকিয়ে রইল। লেখাটা মুছল না।

"চ্যাংড়াদের কাজ। মুছে ফেলুন কমলবাবু।" বিপুল তার টেবল থেকে ঝুঁকে বলল।

"না থাক।" কমল ম্লান হাসল।

"আপনি বরং যুগের যাত্রীর দিন খেলবেন না।"

কমল শোনামাত্র আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিপুল তার শুভার্থী। বিপুল চায় না সে আর অপমানিত হোক। বিপুল ধরেই নিয়েছে, সে পারবে না যুগের যাত্রীকে আটকাতে, তাই বন্ধুর মতই পরামর্শ দিয়েছে। কমল মুখ নামিয়ে বলল, "আমার ওপর কনফিডেন্স নেই আপনার?"

"না না, সে কি কথা। আমি তো খেলাটেলা দেখি না, বুঝিও না। তবে আজকালকার ছেলেপুলেরা বোঝেনই তো, মানীদের মান রাখতে জানে না।"

"কিন্তু আমি যাত্রীর সঙ্গে খেলব।" কমল দৃঢ়স্বরে বলল। "আমাকে অন্য কারণেও খেলতে হবে।"

একঘণ্টা পরেই বেয়ারা একটা খাম রেখে গেল কমলের টেবলে। খুলে দেখল, মেমোরাণ্ডাম। গতকাল অফিস ছুটির নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কমল বিভাগীয় ইনচার্জের বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ করার জন্য এই চিঠিতে তাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ রকম আবার ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমল দেখল, চিঠির নীচে রথীনের সই। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে রাখার সময় লক্ষ্য করল, রণেন দাস মুচকি মুচকি হাসছে। কমল মনে মনে বলল, ব্যালান্স, এখন আমার ব্যালান্স রাখতে হবে যে।

॥ এগারো ॥

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই কমল শুয়ে পড়ে। শরীর গরম, জ্বর-জ্বর ভাব। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অমিতাভর ডাকে চোখ মেলল।

"খাবেন না, রাত হয়েছে!"

কমল উঠে বসার সময় অনুভব করল, তার সারা গায়ে ব্যথা। অমিতাভ দেখল, কমলের চোখ দুটি লাল।

"তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ইতস্তত করে অমিতাভ বলল, "না, একসঙ্গেই খাব।"

"আমার বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, আমি কিছু খাব না।"

অমিতাভ চলে যাচ্ছে, কমল তাকে ডাকল।

"তোমার অ্যালার্ম ঘড়িটা আমায় একটু দেবে? কাল খুব ভোরে উঠতে হবে। প্র্যাকটিসে যাব।"

"প্র্যাকটিসে!" অমিতাভর চোখ বড় হয়ে গেল। "আপনার তো জ্বর হয়েছে!"

এই বলে অমিতাভ এগিয়ে এসে কমলের কপালে হাত রাখল। "প্রায় একশো।"

কমল চোখ দুটি বন্ধ করে অমিতাভর শীর্ণ আঙুলের স্পর্শ অনুভব করতে করতে বলল, "আমাকে খেলতে হবে।"

"এই শরীরে?"

"হ্যাঁ। প্র্যাকটিস না করলে খেলা যায় না। আমি আর

সময় নষ্ট করতে পারি না।"

"কিন্তু—" অমিতাভ চুপ করে গিয়ে একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরল।

কমল একটু হাসল। "সারাজীবন পারফেকশন খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। যে যার নিজের ক্ষেত্রে পারফেক্ট হতে চায়; আমার ক্ষেত্রটা ফুটবল। আমি মানুষ হতে পারব না জেনে ফুটবলার হতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা কি জানো, ফুটবলারের সময়টা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তার শরীর, তার যৌবনই তার সময়, কিন্তু বড্ড ছোট্ট সময়টা। আমার মত তৃতীয় শ্রেণীর ফুটবলার অল্প সময়ের মধ্যে কি করতে পারে যদি না খাটে, যদি না পরিশ্রম করে?"

"কিন্তু আপনি অসুস্থ।"

"হোক। চ্যালেঞ্জ এসেছে, আমি তা নেবই। বহু অপমান সহ্য করেছি, তার জবাব না দিতে পারলে বাকি জীবন আমি কি করে কাটাব?"

কমল উঠে দাঁড়াল। কুঁজো হয়ে খাটের তলা থেকে ধুলোয় ভরা নীল রঙের কেডস্ জুতোজোড়া বার করে বুরুশ দিয়ে ঘষতে শুরু করল। হঠাৎ অমিতাভ বলল, "আপনি ফুটবলকে এত ভালবাসেন!"

মাথা হেলিয়ে কমল কয়েক সেকেণ্ড থেমে বলল, "হ্যাঁ, এজন্য আমায় দাম দিতে হয়েছে। অনেক কিছুই হারিয়েছি, তার বদলে এমন কিছুই পেলাম না যা দিয়ে আমার লোকসান পূরণ করতে পারি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ খেলার জীবনে অনেক শুনেছি, কিন্তু মূর্খ, বোকা, বদমাস অহঙ্কারীদের অপমানের জবাব না দিয়ে আমি রিটায়ার করব না। আমি খেলব,

যেমন করেই হোক, যদি মরতে হয় তবুও।”

“যদি না পারেন? সময় তো ফুরিয়ে এসেছে বললেন।”

“আমি ভয় পাই এ কথা ভাবতে। আমাকে পারতেই হবে, একাই আমায় চেষ্টা করতে হবে। আমি জানি, ঠিক সময়ে বল এগিয়ে দেবো কিন্তু তখন বল ধরার লোক থাকবে না। নিখুঁত পাস দেবো কিন্তু কন্ট্রোলে আনতে পারবে না, বল পাব কিন্তু এত বিশ্রিভাবে আসবে যে কাজে লাগাবার উপায় তখন থাকবে না। নানান অসুবিধা নিয়ে আমার চারপাশের প্লেয়ারদের সঙ্গে মানিয়ে খেলতে হবে। কেউ কারুর খেলা বোঝে না, ওরা এক-একজন এক-এক রকমের। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এজন্য প্র্যাকটিস চাই একসঙ্গে।”

“তাহলেই আপনি সফল হবেন?”

কমল তীব্র কৌতূহল দেখতে পেল অমিতাভর চোখে। এতক্ষণ ধরে এত কথা তারা আগে কখনো বলেনি। কমলের মনে হল, তার কথা শুনতে অমিতাভর যেন ভাল লাগছে। যে ভয়ঙ্কর ঔদাসীন্য এবং চাপা ঘৃণা নিয়ে সে বাবার সঙ্গে কথা বলতো, সেটা সরে গিয়ে একটা কৌতূহলী ছেলেমানুষ বেরিয়ে এসেছে। আর একটা ব্যাপার কমল বুঝতে পারল, তার জ্বর-জ্বর ভাব এবং গায়ের ব্যথা এখন আর নেই।

স্কিপিং-এর দড়িটা টেনে পরীক্ষা করতে করতে কমল বলল, “সফল? তোমার কি মনে হয়?”

অমিতাভ গম্ভীর হয়ে গেল।

কমল উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

“আমি ফুটবলের কিছু বুঝি না।”

“কিন্তু এটা ফুটবল হিসাবে দেখছ কেন, জীবনের যে-কোন

ব্যাপারেই তো এরকম পরিস্থিতি আসে। যে মানুষ একা, যার কেউ নেই, সে তখন সফল হবার জন্য কি করতে পারে?"

অমিতাভ চুপ করে রইল।

কমল উত্তেজিত হয়ে বলল, "সে তখন পারে শুধু লড়তে। তুমি কি নিজেকে একা বোধ করো অমিতাভ?"

অমিতাভ জবাব দিল না।

কমলের উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। আস্তে আস্তে সে বলল, "যোগাযোগ করো। মাঠে আমি খেলার সময় তাই করি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আর তা পারি না। বড় একা লাগে।"

খাটের উপর বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে কমল বলল, "অনেক কথা বললাম, হয়তো এর মানে আমরা কেউই জানি না। তুমি আমাকে ভালবাস না, আমাকে ঘৃণা করো, এটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি।"

কমলের চোখ জলে চিকচিক করছে। স্বর ভারী। অমিতাভ পাথরের মূর্তির মত একইভাবে দাঁড়িয়ে। কমল মুখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল।

"ফুটবল খেলা একদিন আমায় শেষ করতেই হবে, তার-পর আমি কি নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকব?"

একথা শুনে অমিতাভর মুখে কোন্ ভাব ফুটে ওঠে দেখার জন্য মুখ তুলে কমল দেখল, ঘরে অমিতাভ নেই। নিঃসাড়ে সে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় কমল কিটব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরোল। বাগবাজার থেকে ময়দান সে ধীরগতিতে জগ্ করে পৌঁছল যখন, শোভাবাজারের টেণ্টে তখন তিনটি ছেলে

সত্ত এসে পৌঁচেছে। ওরা—স্বপন, রুদ্র আর শিবশম্ভু চটপট তৈরী হয়ে নিল।

"এখান থেকে চৌরঙ্গী রোড ধরে ভিক্টোরিয়া, তারপর পশ্চিমে বেঁকে রেস কোর্সের দক্ষিণ দিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে প্রিনসেপ্ ঘাট। সেখান থেকে গঙ্গা ধরে উত্তরে, তারপর বেঁকে মোহনবাগান মাঠের পাশ দিয়ে নেতাজী স্ট্যাচু ঘুরে আবার এখানে।" কমল দৌড়ের পথ ছকে দিল রওনা হবার আগে। ওরা ঘাড় নাড়ল।

চৌরঙ্গী দিয়ে দৌড়বার সময় একটা বাস থেকে লাফিয়ে নামল ভরত। ওরা থমকে দাঁড়াল।

"কমলদা, আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন, আমিও তো প্র্যাকটিস করব বলে এলুম।"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আসছি। তুই রেডি হয়ে থাক।"

ওরা চারজন আবার ছুটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ছোটার পর কমল পাশে তাকিয়ে স্বপনকে বলল, "সাত-বারো কত হয় রে?"

বিস্ময় ফুটে উঠল স্বপনের মুখে। ছুটতে ছুটতে একি বেয়াড়া প্রশ্ন! ক্লাস এইটে ফেল করার পর স্বপন আর স্কুল-মুখো হয়নি এবং মাথা খাটানোর মত কোন ঝঞ্ঝাটে ব্যাপারে ব্যস্ত হয়নি। কমলের প্রশ্নের জবাব দিতে সে বিড়বিড় করে সাতের ঘরের নামতা শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর স্বপন বলল, "চুরোআশি।"

"দেশ কোথায় ছিল, যশোরে?"

স্বপন একগাল হাসল।

ওরা ছুটতে ছুটতে রবীন্দ্রসদন পার হয়ে ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের পিছন দিয়ে পশ্চিমে চলেছে। কমল এবার রুদ্রকে বলল, "পাখি সব করে রব—পদ্যটা মুখস্থ আছে?"

"না, পড়িনি।"

"পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে?

"মুখস্থ নেই।"

"এগারোর উপপাদ্য কিংবা ভারতের জলবায়ু মনে আছে? তুই তো গত বছর বি-কম্ পরীক্ষা দিয়েছিস, বল তো।"

ছুটতে ছুটতে রুদ্রর ভুরু কুঁচকে গেল। প্রাণপণে সে মনে করার চেষ্টা শুরু করল। কমল তখন শিবশম্ভুকে কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসের ধাঁধায় ফেলে স্বপনকে একটি সহজ মানসাঙ্কের জট ছাড়াতে দিল। কমল ট্রেনিংয়ের অঙ্গ হিসাবে মাথার কাজ ও শরীরের খাটুনি একসঙ্গে করার এই পদ্ধতিটা শিখেছে পল্টুদার কাছে। তাকে দিয়ে তিনি এইভাবে কাজ করাতেন। কমল নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর তা পালন করে এসেছে। পল্টুদা বলতেন, শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন মাথাও আর কাজ করতে পারে না। ফুটবলে মাথা খাটাতে হয় ক্লান্তির মধ্যেও। সেইজন্যে ব্রেনটাকে তৈরি করতে হয়, তারও ট্রেনিং লাগে। যখন দৌড়বি তখন মাথাকে অলস রাখবি না কখনো।

গঙ্গার ধার দিয়ে ছোটার সময় মালভর্তি লরী যেতে দেখে কমল বলল, "তাড়া কর লরীটাকে, দেখি কে ধরতে পারে।"

চারজনে একসঙ্গে স্প্রিণ্ট শুরু করল। প্রায় সত্তর মিটার দৌড়ে লরীটাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে ওরা দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। একটা বাস ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কমল হঠাৎ বলল, "স্বপন, এটাকে ধর।"

হকচকিয়ে স্বপন বলল, "আবার?"

"কুইক্।"

স্বপন প্রাণপণে ছুটে পঁচিশ মিটার যেতেই কমল চেঁচিয়ে তাকে দাঁড়াতে বলল। এইভাবে রুদ্র ও শিবশম্ভুকেও আচমকা সে ছুটতে বলল বাস বা লরীর পিছনে পাল্লা করে। এরপর ওরা আবার ছুটতে শুরু করল। কমল তিনজনের আগে দৌড়চ্ছে। ইডেনের কাছে এসে কমল বলল, "চল, গাছে চড়ি।"

একটা জামরুল গাছ বেছে নিয়ে কমল বলল, "কে আগে চড়ে ওই ছড়ানো ডালটা ধরে ঝুলে নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে!"

চারজনে একসঙ্গে গাছটাকে আক্রমণ করল। স্বপন ধাক্কা দিয়ে কমলকে ফেলে দিয়ে সবার আগে গাছে উঠল, তারপর রুদ্র। শিবশম্ভুর পর কমল যখন গাছে উঠে ডালের প্রান্তে পৌঁছে প্রায় ১২ ফুট উঁচু থেকে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন স্বপন কাঁচুমাচু মুখে কমলকে কিছু বলার জন্য এগোতেই সে হেসে বলল, "ঠিক আছে, খেলার সময়ও ওই রকম শোলডার চার্জ করবি।"

শোভাবাজারের মাঠে ওরা যখন পৌঁছল, ভরত তখন শূন্যে উঁচু করে বল মেরে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে মাথার উপর থেকে বল ধরা প্র্যাকটিস করছিল একা একাই। ওদের দেখে সে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে কেউ একটু প্র্যাকটিস দিয়ে যাও।"

"হবে হবে, আগে একটু জিরোতে দে," কমল এই বলে ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই পর্যন্ত সে প্রায় দশ-বারো মাইল ছুটেছে। ফুটবল মরশুমের মাঝামাঝি এমন পরিশ্রমী ট্রেনিং কেউ করে না।

ঘণ্টা দেড়েক বল দেওয়া, বল ধরা, দুজনের বিরুদ্ধে একজনের ট্যাক্লিং, হেডিং এবং শুটিংএর পর কমলের খেয়াল হল, অফিস যেতে হবে। অফিস থেকে শুধু বেরিয়ে যাওয়ারই নয়, এখন থেকে অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় সম্পর্কেও তাকে সাবধান হতে হবে। তাছাড়া ছেলেগুলো পরশু খেলবে মহমেডানের সঙ্গে। এখন আর খাটানো ঠিক হবে না। কমল টেন্টেই স্নান করে, ক্যান্টিনে ভাত খেয়ে হেঁটেই অফিস রওনা হয়ে গেল।

দুপুরে নন্তু সাহা তাকে জানাল, কাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে খেলা আছে। কমল বলল, "শরীর খারাপ, খেলব না।"

গম্ভীর হয়ে নন্তু সাহা চলে গেল।

॥ বার ॥

যুগের যাত্রীর পনেরোটা ম্যাচ খেলে ২৮ পয়েন্ট। মোহনবাগানের চৌদ্দটি খেলায় ২৪, ইস্টবেঙ্গলের চৌদ্দটি খেলায় ২৬, মহমেডানের পনেরোটি খেলায় ২৫ পয়েন্ট। আর শোভাবাজারের ষোলটি খেলায় ৬ পয়েন্ট। লীগের প্রথমার্ধ শেষ হয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ময়দানে গুলতানি শুরু হয়ে গেছে—দ্বিতীয় ডিভিশনে শোভাবাজার অবধারিত নামছে। বালী প্রতিভা, স্পোরটিং ইউনিয়ন, জর্জ টেলিগ্রাফ, কালিঘাট দু-তিন পয়েন্টে শোভাবাজারের উপরে।

যুগের যাত্রীর সঙ্গে লীগের প্রথম খেলার আগের দিন, অফিসের লিফ্‌টে ওঠার জন্য কমল যখন দাঁড়িয়ে, পিছন থেকে একজন বলল, "কমলবাবু, কাল খেলছেন তো ?"

গলার স্বরে চাপা বিদ্রূপ বিচ্ছুরিত হল। কমল জবাব দিল না। প্রশ্নকারী তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠল। এবার রেগে বলল, "আরে মশাই, যেটুকু নাম এখনো লোকে করে সেটা ডুবিয়ে কোনো লাভ আছে ? অনেক তো খেললেন সারা জীবনে।"

লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। লাইন দেওয়া লোকেরা ঢুকল, তাদের সঙ্গে কমলও। দরজা বন্ধ হবার সময় সে শুনতে পেল, লাইনে দাঁড়ানো প্রশ্নকারী সকলকে শুনিয়ে বলছে, "বুঝলেন, এরাই ফুটবলের ইজ্জৎ নষ্ট করে।"

টিফিনের সময় কমল নিজের চেয়ার থেকে উঠল না।

আবার কে তাকে শুনিয়ে বিদ্রূপাত্মক কথা বলবে কে জানে! একমনে মাথা নিচু করে সে কাজ করে চলেছে। চমকে উঠল যখন তার সামনে একটা লোক হাজির হয়ে বলল, "কমল, আছ কেমন?"

মুখ তুলে কমল দেখল, যুগের যাত্রীর তপেন রায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, একশো টাকা ধার নেওয়ার কথাটা—মুখটা পাংশু হয়ে গেল।

"খেলাটেলা কেমন চলছে, শুনলুম দারুণ প্র্যাকটিস করছ?" চেয়ার টেনে বসতে বসতে তপেন রায় বলল।

"তপেনদা, আপনার টাকাটা এখনো দিতে পারিনি, এবার মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।"

"টাকা! কিসের টাকা?" তপেন রায় আকাশ থেকে পড়ল।

কমল আরো কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "মনে আমার ঠিকই আছে, তবে একবারে একশোটা টাকা দেওয়ার সামর্থ্য তো নেই।"

তপেন রায় কিছুক্ষণ কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন অতিকষ্টে মনে করতে পারল। তারপর বলল, "ও হো, সেই টাকাটা! আমি তো ভুলেই গেছলুম। আরে দূর, ওটা তোমায় ফেরত দিতে হবে না।" তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "যাত্রীর কাছে কত টাকা তুমি পাও, সেটা তো আমি ভাল করেই জানি। তোমায় ঠকিয়েছে কি ভাবে তার সাক্ষী আমি ছাড়া আর কে! এ টাকা তো আর মামলা করে যাত্রী আদায় করতে পারবে না। যা পেয়েছ তাই নিয়ে নাও।"

মুহূর্তে কমল সাবধান হয়ে গেল। এতদিন ফুটবল খেলে

সে মাঠের লোকেদের চিনেছে। হঠাৎ তপেন রায়ের আবির্ভাব এবং খুবই বন্ধুর মত কথাবার্তা তার ভাল লাগল না। সে সতর্ক স্বরে বলল, "তারপর, কি মনে করে হঠাৎ···।"

"বলছি।" তপেন রায় সিগারেট বার করল, ধরাল এবং প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "যুগের যাত্রীকে কমল গুহ যে সার্ভিস দিয়েছে তা ভোলার নয়। কিন্তু যাত্রী তার বিনিময়ে তাকে কি দিয়েছে? কিছুই নয়। এই নিয়ে ক্লাবে অনেকে অনেক কথা বলেছে। কমিটি মিটিং ডাকা হয়েছিল। ঠিক হয়েছে, তোমাকে এবারের লীগের শেষ খেলার দিন মাঠেই পাঁচ হাজার টাকার চেক্ দেওয়া হবে।"

"যাত্রীর সঙ্গে লীগের শেষ খেলা কিন্তু শোভাবাজারের।"

"তাই নাকি! তাহলে তো ভালোই। কিন্তু সবার আগে তোমার অনুমতি চাই, তুমি গ্রহণ করবে কি না। অবশ্য বলে রাখছি, পরশু দিনই কমিটির একটা মিটিং আছে, ব্যাপারটা তখনই পাকাপাকি ঠিক করা হবে।"

কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল তপেন রায়ের চোখ দুটি। অতি সরল। ভিতর থেকে আন্তরিকতা ঠিকরে বেরোচ্ছে। কমল মনে মনে হেসে বলল, "কাল যাত্রীর সঙ্গে খেলার পর আপনাকে জানাব।"

"কাল তুমি খেলছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

তপেন রায় ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল, "এই বাজারে পাঁচ হাজার টাকার দাম কম নয়। বলতে গেলে এক রকম পড়েই পাওয়া। মাথা গরম করে হারিয়ো না এটা। যাত্রী তো নাও দিতে পারে, তবু

দেবে বলে মনস্থ করেছে। এতে তোমাকে যেমন সম্মান দেওয়া হবে, তেমনি যাত্রীর উপরও প্লেয়ারদের কনফিডেন্স আসবে, তাই নয় কি ?”

কমল ঘাড় নাড়ল।

“এখনকার ক্লাবগুলো যা হয়েছে, বুঝলে কমল, একেবারে নেমকহারাম। প্লেয়ারবাও সেই রকম। পয়সা ছাড়া মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু যাত্রী তো সেরকম ক্লাব নয়। প্লেয়ারদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক না থাকলে ক্লাব চলে না।” তপেন রায় আবেগ চাপতে গিয়ে চুপ করল। কমল কথা বলল না।

“তাহলে তুমি এখন বলবে না টাকা নিতে রাজী কি না ?”

“না। কাল খেলার পর এ নিয়ে ভাবব।”

তপেন রায় চলে যাবার পর বিপুল ঘোষ গলা বাড়িয়ে বলল, “পাঁচ হাজার টাকা ! ব্যাপার কি ?”

“পরীক্ষা দিলাম। স্টপারে খেলি, নানান দিক থেকে আক্রমণ আসে। এটাও একটা।”

“তার মানে ?”

“আমরা সবাই তো স্টপার ঘোবদা, কেউ মাঠের মধ্যে, কেউ মাঠের বাইরে। ঠেকাচ্ছি আর ঠেকাচ্ছি। এটাও ঠেকালাম—লোভকে। ঘুষ দেবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল লোকটা। কাল ওদের টিমের সঙ্গে খেলা। আমাদের মজুমদার সাহেবের টিম। এ বছর লীগ চ্যামপিয়ন হবার জন্য খেলছে, ভালই খেলছে। হয়তো হয়েও যাবে। কিন্তু চ্যামপিয়ন হবার পথে যাতে একটিও কাঁটা না থাকে সেই ব্যবস্থা করতে এসেছিল। আমাকে ওরা একটা কাঁটা ভাবে।”

"ঘুষ দিয়ে? না না মশাই, কাল আপনি ভাল করে খেলুন। দারুণ খেলুন। আচ্ছা করে জব্দ করে দিন।"

কমল দেখল, বিপুল ঘোষের সারা মুখ আন্তরিকতায় কোমল ও উজ্জ্বল।

"কাল অফিসে আসছেন তো?" দূর থেকে রণেন দাস প্রশ্ন করল।

"কেন?" কমল সচকিত হয়ে বলল।

"সেটা আপনি ভালই জানেন। তবে বলে রাখছি, পাঁচটার আগে আপনাকে আমি ছাড়তে পারব না।"

"জানি আমি। তবে কাল আমি ক্যাজুয়াল নিচ্ছি।"

অফিস ছুটির পর শোভাবাজার টেণ্টে আসা মাত্র কৃষ্ণ মাইতি হাত ধরে বলল, "গুলোকে শিক্ষা দিতে হবে কমল। ব্যাটা টাকা মেরেছে কাজ হাসিল করে নিয়ে। পয়েণ্ট চাই-ই চাই। তুই কিন্তু প্রধান ভরসা। ক্লাবের সবাই তোকে খেলানোর এগেনস্টে, আমি জোর করে বলেছি, কমলকে খেলাতেই হবে।"

নার্ভাস বোধ করল কমল। বিব্রত স্বরে বলল, "কিন্তু কেষ্টদা, একা আমার ওপর এতটা ভরসা করবেন না, করা উচিত নয়। ফুটবল একজনের খেলা নয়।"

"তুই একাই এগারোজন হয়ে খেলতে পারিস, যদি মনে করিস খেলবো। তাছাড়া—মনে আছে সেই চাকরির কথাটা, পল্টু মুখুজ্যের মেয়ের চাকরি! যদি কাল একটা পয়েণ্ট আনতে পারিস, গ্যারাণ্টি দিচ্ছি চাকরিটা হবে।"

কমল তর্ক করে কথা বাড়াল না। হঠাৎ সে ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করল। অনেক কিছু নির্ভর করছে

কালকের খেলার উপর। এখন যার সঙ্গেই দেখা হবে, সে মনের উপর একটা দায়িত্বের পাথর চাপিয়ে দেবে। কমল চেয়ার নিয়ে টেণ্টের বাইরে বেড়ার ধার ঘেঁষে বসল।

ভরত এসে বলল, "কমলদা, একটা কথা বলার ছিল। খুবই জরুরি কিন্তু এখানে বলব না। আপনি বাইরে আসুন, মিনিট পাঁচেক পর আমি টাউন ক্লাব টেণ্টের সামনে থাকব।"

এই বলেই ভরত হনহন করে বেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে কমল চারপাশে তাকাল। ক্যাণ্টিনের কাছে সত্য আর দেবীদাস হাসাহাসি করছে। স্বপন একটু আলাদা দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছে। টেণ্টের মধ্যে যথারীতি টেবিল ঘিরে গুলতানি। ভরতের কী এমন কথা থাকতে পারে যা একান্তে বলা দরকার!

কমল টাউন টেণ্টের কাছে পৌঁছতেই অপেক্ষমান ভরত বলল, "কমলদা, আমাদের তুজন কাল গট্ আপ্ হয়েছে।"

শোনামাত্র কমল জমে গেল। "গট্ আপ্! কারা?"

"আজ সকালে যাত্রীর লোক এসেছিল আমার বাড়িতে। সঙ্গে ছিল শম্ভু। টেরিলিন স্যুট করে দেবে যাত্রী। শম্ভু আর সত্য গোলাম আলীতে মাপ দিয়ে এসেছে।"

"তুই গেলি না?"

ভরত শুধু হাসল। কমলও হাসল। তারপর ভরতের পিঠ চাপড়ে বলল, "এখন কাউকে বলিসনি এসব কথা। আগে খেলাটা হোক।"

"সলিলের কিছু খবর জানেন, আসে না কেন? ও থাকলে খানিকটা সামলানো যেত।"

"সলিল একটা কাজ পেয়েছে, খেলার জন্য আর সময় পায় না। হয়তো আর কোনদিনই পাবে না। কিন্তু ভরত,

বাটার সঙ্গে খেলার মত অবস্থা কাল যেন হবে মনে হচ্ছে।"

"কি জানি!" অনিশ্চিত স্বরে ভরত বলল, "আমাদের আর একটা ছেলেও নেই যাকে নামানো যায়। নইলে কেষ্টদাকে বলে সত্য আর শম্ভুকে বসিয়ে দেওয়া যেত।"

ম্লান হেসে কমল বলল, "তাহলে কাল ভাগ্যের উপরই ভরসা করতে হবে।"

"হ্যাঁ, ভাগ্যের উপরেই।"

॥ তের ॥

যুগের যাত্রী ৫—০ গোলে শোভাবাজারকে হারাল।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে কমল শুয়ে। অ্যালার্ম ঘড়ির টিকটিক শব্দ একটানা তার মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। কমল হাত দিয়ে দু'কান চেপে অস্ফুটে কাতরাল। এখনো কানে বাজছে ভয়ঙ্কর চীৎকার-গুলো। ঘড়িটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু পাঁচটা গোলের চীৎকার!

গ্যালারীর মাঝখানের সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় উপর থেকে তার মাথায় থুথু পড়ে, ইটের টুকরো লাগে পিঠে। একটা চীৎকারও শুনেছিল, "কি রে কমল, অনুপমকে আটকাতে পারিস বলেছিলি না!"

আজ অনুপম তিনটি গোল দিয়েছে। তবে হ্যাটট্রিক হয়নি। কমল বিছানায় বার কয়েক কপালটা ঠুকল। অজান্তে একটা গোঙানি মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"কি গো কমল, যাত্রীর জার্সিকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা এবার ছাড়ো, এবার ছাড়ো।"

গুলোদার হাসিখুশি মুখ আর চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাগুলো যেন বিছানার মধ্যে থেকে উঠে আসছে। বিছানাটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একশা করা যায়, কিন্তু কথাগুলোকে!

"আমি কি করব, যিনি টিম করেছেন তাকে গিয়ে বলুন।

বুড়ো প্লেয়ার দিয়ে যদি ফুটবল খেলাতে চান তা হলে খেলান। বলিহারি সখ! নিজেরও তো একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকে।" সরোজ খেলাশেষে মাঠের উপর দাঁড়িয়ে একজনকে যখন কথাগুলো বলছিল, কমল মুহূর্তের জন্য দেখেছিল চাপা তৃপ্তির আমেজ তার চোখেমুখে ছড়িয়ে রয়েছে।

খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই ভরত ছুটে গিয়ে মাঠের মধ্যেই শম্ভুকে চড় কষায়। শম্ভু লাথি মারে ভরতকে। দু'জনকে যখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন চীৎকার করে শম্ভু বলে, "গোল কি আমার দোষে হয়েছে? ওই লোকটা, ওই লোকটার জন্য।"

শম্ভুর আঙুল একটা ছোরার মত উঠে কমলকে শিকার করে। কোনদিকে না তাকিয়ে কমল মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

"এত ভরসা করেছিলুম তোর ওপর। আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিলি।" কেষ্টদার হতাশ এবং বিরক্ত কণ্ঠস্বরে কমলের চকিতে মনে পড়েছিল, অরুণার চাকরিটা বোধহয় হল না!

মুখ দেখাবার উপায় কোথাও আর রইল না। বাটার সঙ্গে খেলাটাই আবার অনুষ্ঠিত হল। তবে যাত্রী আরো দক্ষ, আরো কঠিন এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ। কমল চোখ বুঁজে এখনো দেখতে পাচ্ছে, অনুপম আর প্রসূন তার দু'পাশ দিয়ে ঢুকছে আর ফাঁকা মাঝমাঠ দিয়ে বল নিয়ে উঠে আসছে যাত্রীর রাইট ব্যাক। স্বপন আর রুদ্র কোন্‌দিকে কাকে আটকাবে ভেবে পাচ্ছে না। কমল স্থির করেছিল আজ সে অনুপমকে রুখবে। কিন্তু অনুপমের পাশাপাশি প্রসূন সব সময় ছিল তাকে ধাঁধায় ফেলার জন্য। যেখানেই বল প্রসূন সেখানে তার দলের খেলোয়াড়ের পাশে গিয়ে হাজির

হয়েছে। শোভাবাজারের একজনের সামনে যাত্রীর দু'জন ফরোয়ার্ড সব সময়ই। লোক পাহারা দেবে না জমি আগলাবে কমল এই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি লোকের অভাবে। এবং কেন এই অভাব ঘটল একমাত্র সে আর ভরত তা জানে।

কিন্তু সে-কথা এখন বললে লোকে বলবে সাফাই গাইছে। উপায়ও নেই, মুখ দেখাবার কোন উপায় আর রইল না। বিদ্রূপ আর ইতর মন্তব্য শুনতে হবে বহুদিন। কমল বিছানায় মুখটা চেপে ধরে থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করল।

হঠাৎ ঘরের আলোটা কে জ্বালল। কমল ছিটকে উঠে বসল।

"কমলদা, আমি এসেছি।" ঘরের মধ্যে সলিল দাঁড়িয়ে। মুখে লাজুক বিব্রত হাসি।

"কেন?"

"শুনলুম আজ পাঁচ গোলে শোভাবাজার হেরেছে।"

কথা না বলে কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

"আমি খেলব কমলদা। আমি আর বাড়িতে ফিরব না। কাজ আমি করতে চাই না, আমি খেলতে চাই। আমাকে শুধু দু'মুঠো খেতে দেবেন আর একটু ঘুমোবার জায়গা।"

উঠে দাঁড়াল কমল।

"আমি বাড়ির জন্য আর ভাবব না। ওদের বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি—"

এরপরই সলিল পেটটা চেপে ধরে ছিটকে দেয়ালে আছড়ে পড়ল কমলের লাথি খেয়ে।

"কি জন্য এসেছিস এখানে! রাসকেল, করুণা দেখাতে এসেছিস? পাঁচ গোল খেয়েছি বলে সাহায্য করতে এসেছিস?

ফুটবল খেলে আমায় উদ্ধার করতে এসেছিস ?" বলতে বলতে কমল আবার লাথি কষাল। সলিল কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তার পিঠে কোমরে মাথায় কমল পাগলের মত এলোপাথাড়ি লাথি মারতে শুরু করল। চুল ধরে টেনে তুলে মুখে ঘুষি মারল।

"আমায় মারবেন না কমলদা, আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।" সলিল উঠে বসতেই কমল ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

"কেন এসেছিস, বল কেন এসেছিস ?"

সলিল হাঁ করে মুখটা তুলে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে আর চোখ বেয়ে জল। ও বলার আগেই দরজার কাছে অমিতাভ বলে উঠল, "ছাড়ুন, ওকে ছাড়ুন।"

দ্রুত ঘরে ঢুকে সে সলিলের চুল-ধরা কমলের হাতে ধাক্কা দিল।

"তোমার কি দরকার এখানে ?"

"আপনি এ-ভাবে মারছেন কেন ওকে ?"

"আমি যা করছি তাতে তোমার নাক গলাতে হবে না।"

"একজনাকে এ-ভাবে মারবেন আর তাই দেখে বাধা দেবো না ? দেখুন তো কি অবস্থা হয়েছে ওর ! জানোয়ারকেও এভাবে মারে না।"

"না না, কমলদা আমায় মারেননি।" সলিল দু'হাত তুলে অমিতাভর কাছে আবেদন জানাল ঘড়ঘড়ে স্বরে। "কমলদা আমায় কখনো মারেন না, শুধু আমায় শাস্তি দেন।"

"চুপ করো তুমি।" অমিতাভ ধমক দিল সলিলকে। তারপর ঝুঁকে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে সলিলের কাঁধে আঙুল

ছোঁয়াল। "এসো আমার ঘরে, মুখ ধুইয়ে মলম লাগাতে হবে।"

অমিতাভ বেরিয়ে যাবার সময় থমকে একবার কমলের দিকে তাকাল। অদ্ভুত একটা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে কমলের মুখে ফুটে উঠেছে দীনতার ছাপ। বয়সটা যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। কমল কুঁজো হয়ে ধীরগতিতে এসে খাটের উপর বসল। শূন্য দৃষ্টিতে সলিলের দিকে তাকিয়ে থেকে অন্যমনস্কের মত চুলে আঙুল চালাতে লাগল।

সলিল ওঠবার চেষ্টা করে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পেট চেপে বসে পড়ল। আবার চেষ্টা করল ওঠবার। আবার বসে পড়ল। অসহায়ভাবে কমলের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে কমল তার দিকে তাকিয়ে, চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই।

"আপনার মাথায় দাগটা এখান থেকেও আমি দেখতে পাচ্ছি কমলদা।"

কমল নিরুত্তর রইল। সলিল হাসবার চেষ্টা করল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কমল চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর অমিতাভ ঘরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন।"

কমল মুখ তুলে কিছুক্ষণ ধরে অমিতাভর মুখের উপর চোখ রাখল। ক্রমশ সংবিৎ ফিরে এল তার চাহনিতে। মুখটা দুমড়ে গেল বেদনায়। ফিসফিস করে সে বলল, "আমি শেষ হয়ে গেলাম।"

অমিতাভ আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ চৌদ্দ ॥

পরদিন থেকে কমল যেন বদলে গেল। চেহারায় এবং মনেও। অফিসে সারাক্ষণ নিজের চেয়ারে থাকে। কথা বলে না প্রয়োজন না হলে। ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। গড়ের মাঠের পথ আর মাড়ায় না। অফিসে অরুণা ফোন করেছিল। কমল কথা বলেনি। বিপুল ঘোষকে সে বলতে বলে, 'অফিসে আসেনি, জানিয়ে দিন।'

কমল যতটা ভেবেছিল তেমন কোন বিদ্রূপ অফিসে বা অন্য কোথাও তাকে শুনতে হয়নি। সবাই যেন ধরেই নিয়েছে এমনটিই হবে। ওর মনে হয়, এইরকম ঔদাসীন্যের থেকে বরং বিদ্রূপই ভাল ছিল। মাসের মাইনে পেয়েই সে রথীনের ঘরে গিয়ে একশো টাকার একটি নোট টেবলে রেখে বলে, "ধার নিয়েছিলাম, সেই টাকাটা।"

"ধার! আমি তো দিইনি। যে দিয়েছে তাকে দিয়ে এসো।" রথীন কমলের দিকে আর না তাকিয়ে কাজে মন দেয়।

কমল দ্বিধায় পড়ে। অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবে সে স্থির করে, তপেন রায়ের হাতেই টাকাটা দিয়ে আসবে। ছুটির পর সে যাত্রীর টেন্টের দিকে রওনা হয়। যখন পৌঁছল, যাত্রীর প্লেয়াররাও ঠিক তখনই এরিয়ান মাঠ থেকে ফিরল বি এন আর-কে ২—০ গোলে হারিয়ে। প্রায় শ'খানেক লোক হৈ-চৈ করছে টেন্টের মধ্যে ও বাইরে। কমল একধারে

দাঁড়িয়ে খুঁজতে লাগল তপেন রায়কে।

"আরে কমলোবাবু, ইখানে দাঁড়িয়ে!" ক্লাবের বুড়ো মালী দয়ানিধি কমলকে দেখে নমস্কার করে এগিয়ে এল।

"তপেনবাবুকে খুঁজছি, কোথায় বলতে পার ?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়, যান না।"

ইতস্তত করে কমল ভিতরে গেল।

তপেন রায় কয়েকটি ছেলের পথ আটকে প্লেয়ারদের ড্রেসিংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলছে, "না না, এখন নয়। ওরা এখন টায়ার্ড। এখন কোন কথাবার্তা নয়।"

কমল এগিয়ে গেল। তাকে দেখে তপেন রায় অবাক হয়েও স্বাভাবিক স্বরে বলল, "কি খবর কমল ?"

"একটু দরকার ছিল।"

"দেখছ তো কি অবস্থা, এখান থেকে নড়ার উপায় নেই, যা বলার বরং এখানেই বলো।"

কমল নোটটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরে বলল, "টাকাটা দিতে এসেছি।"

তপেন রায় কি ভেবে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "ও টাকা তুমিই রাখো। এত বছর যাত্রীতে খেলে গেলে—ট্রফি-ফ্রফি তো কিছুই ক্লাবকে দিতে পারোনি, টাকা ফেরত দিয়ে ক্লাবের কি আর এমন উপকার করবে ? এ-বছর যাত্রী লীগ পাচ্ছেই, শুধু বড় টিম দুটোর সঙ্গেই আসল যা খেলা বাকি ; তারপর শুধু বাজিই পুড়বে দশ হাজার টাকার। একশো টাকার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।"

শুনতে শুনতে কমলের পা দুটো কেঁপে উঠল। মাথার মধ্যে লক্ষ গোলের চীৎকার। তবু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "বাজি

পোড়ানো দেখতে আমি আসব। কিন্তু টাকা আপনাকে ফেরত নিতে হবে। যাত্রীর কাছে আমি ঋণী থাকব না, থাকতে চাই না।"

ওদের ঘিরে বহু লোকের ভিড় জমে গেছে। গুলোদা এই সময় টেন্টে ঢুকল। ভিড় দেখেই কৌতূহলভরে এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কি? আরে কমল যে!"

"এক সময় দরকারে টাকা নিয়েছিলুম। ফেরত দিতে এসেছি, কিন্তু তপেনদা নিচ্ছেন না।"

"সেই টাকাটা গুলোদা, আপনিই তো বলেছিলেন দরকার নেই ফেরত নেবার।" তপেন রায় মনে করিয়ে দিল ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

"অ। দিতে চায় যখন নিয়ে নাও তবে", গুলোদা অতি মিহি স্বরে বলল, "যাত্রীর শেষ খেলা শোভাবাজারের সঙ্গে, যদি কমল কথা দেয় সেদিন খেলবে না, তা হলেই ফেরত নেব।"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, "খেললেই বা কমল গুহ, যাত্রী এবার দশ গোল ভরে দেবে শোভাবাজারকে।"

স্মিতমুখে গুলোদা বলল, "সেইজন্যই তো বলছি, কমলের মত এতবড় প্লেয়ারের টিম দশ গোল খাচ্ছে, এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। এটা যাত্রীর পক্ষেও বেদনাদায়ক হবে। হাজার হোক এক সময় কমল তো যাত্রীর-ই ছিল।"

"ঠিক ঠিক, গুলোদা ঠিক বলেছেন।" ভিড়ের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে বলল, "কমলদা, আপনি কিন্তু সেদিন খেলতে পারবেন না। আপনার ইজ্জতের সঙ্গে যাত্রীর ইজ্জতও

জড়িয়ে আছে।"

পাংশু কালো মুখ নিয়ে কমল হাসল। এরা আজ অপমান করার জন্য পন্থা নিয়েছে করুণা দেখাবার। ওর ইচ্ছে করল নোটটা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠতে—আমি এখনো শেষ হয়ে যাইনি, যাইনি। ঠিক তখনই কমলের বুকের মধ্যে এক বৃদ্ধের কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল—ব্যালান্স, কমল, ব্যালান্স কখনো হারাসনি।

ম্লান চোখে কমল সকলের মুখের উপর দিয়ে চাহনি বুলিয়ে ধীর স্বরে বলল, "টাকাটা ফেরত নিন। আমার আর খেলার ইচ্ছে নেই।"

নোটটা তপেন রায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে কমল বেরিয়ে এল যাত্রীর টেন্ট থেকে। মাথার মধ্যেটা অসাড় হয়ে গেছে। হাঁটু দুটো মনে হচ্ছে মাখনে তৈরী; এখনি গলে গিয়ে তাকে ফেলে দেবে। বুকের মধ্যে দপদপ করে জ্বলে উঠতে চাইছে শোধ নেবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা। যে বিমর্ষতা, হতাশা তাকে এই ক'দিন দমিয়ে রেখেছে, সেটা কেটে গিয়ে এখন সে অপমানের জ্বালায় ছটফট করে উঠল। উদ্দেশ্যহীনের মত ময়দানের মধ্য দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে কমল কখন যে শোভাবাজার টেন্টে পৌঁছে গেছে খেয়াল করেনি। ডাক শুনে তাকিয়ে দেখল, ভরত আর সলিল ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে। ভরত এগিয়ে এল, সলিল এল না।

"আপনার কি অসুখ করেছে কমলদা? কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে। অনেকদিন আসেন না, ভেবেছিলুম আপনার বাড়িতে যাব।"

প্রশ্নটা এড়িয়ে কমল বলল, "ক্লাবের খবর কি, বল।"

"খবর আর কি, যা হয়ে থাকে প্রতি বছর তাই হচ্ছে।

তিনটে ড্র করে তিন পয়েন্ট ম্যানেজ হয়েছে, তবু এখনো ভয় কাটেনি।" ভরত বিপন্ন হয়ে বলল, "ভাল লাগে না কমলদা। এইভাবে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার কোন মানে হয় না।"

"সলিল কি খেলছে ?"

"কেন, আপনি জানেন না! ও তো লাস্ট চারটে ম্যাচে খেলেছে, বেশ ভাল খেলছে। ইস্ট বেঙ্গলের দিন হাবিবকে নড়াচড়া করতে দেয়নি। সব কাগজে ওর কথা লিখেছে।"

"তাই নাকি, আমি কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছি। আর কি খবর আছে ?"

"আর যা আছে সেটা খুব মজার। সত্য আর শম্ভু তো গোলাম আলীতে স্যুটের মাপ দিয়ে এসেছিল। সাত দিন পর ট্রায়াল দিতে গিয়ে শোনে, গুলোদা টেলিফোন করে আগেই জানিয়ে রেখেছিল, তার অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত কাঁচি ধরবে না, শুধু মাপটা নিয়ে রেখে দেবে। গুলোদা আর ফোন করেনি। শুনে সত্য আর শম্ভু তো ফুঁসছে, এভাবে বোকা বনে যাবে ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। কথাটা কাউকে বলতেও পারছে না, কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া ওদের আর উপায় নেই। এখন বলছে, রিটার্ন ম্যাচটায় যাত্রীকে দেখে নেবে।"

কমল ফিকে হাসল মাত্র কথাগুলো শুনে। বলল, "সরোজ কোথায়, প্র্যাকটিস কেমন চলছে ?"

"কোথায় প্র্যাকটিস! সরোজদা তো প্রায় দশ দিন হল টেন্টই মাড়ায় না। শুনছি জামসেদপুর না দুর্গাপুরে চাকরি পেয়েছে। সলিল, স্বপন, রুদ্র, এরাই যা বল নিয়ে সকালে নাড়াচাড়া করে। সকালে এখন এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট ছাড়া আর সব বন্ধ করে দিয়েছে কেষ্টদা।"

"সলিল চাকরিটা করছে কি এখনো ?"

"একদিন ওর বাবা এসেছিল খুঁজতে। সলিল কাজ ছেড়ে দিয়েছে, বাড়িতেও থাকে না। কোথায় থাকে কেউ জানে না। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, ঠিকানা দেয়নি।"

"সলিলকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

কমল বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হতেই ভরত মাথা চুলকে বলল, "সেদিনের পর থেকে আর আপনি মাঠে আসেন না।"

"হ্যাঁ, আর ভাল লাগে না। মাঠ থেকে এবার চলে যাওয়াই উচিত। আমার কোনো ফোন এসেছিল কি ?"

"জানি না তো।"

॥ পনের ॥

বাড়ি ফিরেই কমল শুনল যে, কালোর মা গজগজ করে চলেছে, "বাইরের লোকের প্যাণ্ট আমি কেন কাচব? বাইরের লোকের খাওয়া এঁটো বাসন মাজতে হবে, এমন কথা তো বাপু ছিল না। মাইনে না বাড়ালে আমি আর বাড়তি কাজ করতে পারব না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

"বাইরের লোকটা আবার কে?" কমল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে।

"কেন, দাদাবাবুর যে বন্ধুটি থাকে!"

"থাকে! দাদাবাবুর বন্ধু?"

"কেন, আপনি জানেন না?" কালোর মা বিস্ময়ে চোখ কপালে তোলার উপক্রম করতে কমল আর কথা বাড়াল না।

রাত্রে কমলের মনে হল, অমিতাভর ঘরে চাপা স্বরে কারা কথা বলছে। সকালে অমিতাভর ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবার সময় খুঁটিয়ে ঘরের মধ্যে লক্ষ্য করে সে কিছুই বুঝতে পারল না। ভাবল, অমিতাভকে জিজ্ঞাসা করবে।

অফিসে বেরোবার সময় অমিতাভ তার কাছে কুড়িটা টাকা চাইল। এক সপ্তাহে চল্লিশ টাকা দিয়েছে, তাই কমল অস্বস্তিভরে বলল, "হঠাৎ এত ঘন ঘন টাকার দরকার হচ্ছে যে? আমি যা মাইনে পাই তাতে এভাবে চললে

কুলিয়ে ওঠা তো সম্ভব হবে না।"

"এক বন্ধুর অসুখ, তাকে ওষুধ কিনে দেবার জন্য—" অমিতাভ ঢোঁক গিলে বলল।

"কালোর মা বলছিল তোমার এক বন্ধু নাকি এখানে খায়?"

"তিন-চারদিন খেয়েছে। আর খাবে না।"

টাকা দেবার সময় কমল বলল, "খাওয়ার জন্য আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।"

এরপর কমল লক্ষ্য করল, অমিতাভ যেন ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। গম্ভীর ভারিক্কি ভাবটা আর নেই, চলাফেরায় চঞ্চলতা দেখা যাচ্ছে, চেঁচিয়ে হঠাৎ গানও গেয়ে ওঠে, এমনকি একদিন সকালে উঠে চা তৈরী করে সে কমলকে ডেকে তুলেছে। কমল লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "খেলা ছেড়ে দিয়ে দেখছি অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সকালের এক্সারসাইজটা আবার শুরু করতে হবে কাল থেকে।"

"আপনি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন?" অবাক হয়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

কমল জবাব না দিয়ে বাজার রওনা হয়। সেইদিন শোভাবাজার টেণ্টে গিয়ে সে শোনে, মহমেডানের সঙ্গে খেলায় বলাই ও অ্যামব্রোজ মারপিট করায় রেফারী দু'জনকেই মাঠ থেকে বার করে দিয়েছে, আর শ্রীধরের হাঁটুর পুরনো চোটটায় আবার লেগেছে, যার ফলে তার দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। টেণ্টে সকলেরই মুখ শুকনো, দুশ্চিন্তায় কপালে কুঞ্চন। খেলার মত এগারজন প্লেয়ার এখন শোভাবাজারের

নেই। সহ-সম্পাদক অবনী মণ্ডল ওকে দেখে ছুটে এসে বলে, "কমলবাবু, আপনার কাছেই যাব ভাবছিলুম। আপনাকে বাকি ম্যাচ তিনটে খেলতে হবে।"

"না।" কমল গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আর খেলব না।" তারপর সে টেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ে হতভম্ব অবনী মণ্ডলকে ফেলে রেখে।

অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে কমল বাড়ি ফিরল। শোভাবাজার এখন সত্যিই দুরবস্থায়। অথচ সে বলে এল খেলবে না। এই ক্লাব থেকেই সে গড়ের মাঠে খেলা শুরু করেছিল। ব্যাপারটা নেমকহারামির মত লাগছে। ইচ্ছে করলে তিনটে ম্যাচ এখন সে অনায়াসে খেলে দিতে পারে। শেষ ম্যাচটা যাত্রীর সঙ্গে। গুলোদার বিদ্রূপভরা কথাগুলো কমলের কানে বেজে উঠল। তপেন রায়ের হাতে একশো টাকার নোটটা দেবার আগে সে বলেছিল, আর খেলব না। তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছিল মাথার মধ্যে। আর এখন শুধু ছাই হয়ে পড়ে আছে তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটা।

অমিতাভর ঘর অন্ধকার। কমল নিজের ঘরে ঢুকে জামা-প্যাণ্ট বদলে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিল আলো নিভিয়ে। কুড়ি বছরের খেলার জীবনের অজস্র কথা আর দৃশ্য মনের মধ্যে ভীড় করে ঠেলাঠেলি করছে। তার মধ্যে বার বার দেখতে পাচ্ছে পল্টুদাকে, শুনতে পাচ্ছে তার গলার স্বর—"প্র্যাকটিসটা আরো ভালো করে কর। হতাশা আসবে, তাকে জয় করতেও হবে···তুই খেলা ছেড়ে দিবি বলছিস, তার মানে তুই বড় খেলোয়াড় হতে পারিসনি।"

না পারিনি। কমল বার বার নিজেকে শোনাতে থাকে, পারিনি, পারিনি, আমি হতে পারিনি। আমার মধ্যে প্রশান্তি

আসেনি। অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

অমিতাভর ঘরের দরজা খোলার এবং আলো জ্বালানোর শব্দ হল। কমলের মনে পড়ল আজ সকালে সে স্কিপিং দড়িটা খুঁজে পায়নি। অমিতাভ কি কোন কাজে নিয়ে গেছে তার ঘরে! জিজ্ঞাসা করার জন্য সে উঠল। আলো জ্বালল। চটি পরে 'অমিত' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরোবার সময় তার মনে হল, পাশের ঘরে দ্রুত একটা ঘষড়ানির শব্দ হল। দ্রুত অমিতাভর ঘরের দরজায় পৌঁছে সে দেখল, খাটের নীচে কেউ ঢুকে যাচ্ছে, পলকের জন্য দুটি পা শুধু দেখতে পেল।

চোর! কমল থমকে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চেঁচাল না। পা দুটো তার চেনা মনে হল। প্যাণ্টের যতটুকু দেখতে পেয়েছে, সেটাও খুব পরিচিত। সলিল!

দু'হাতে পাঁউরুটি নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে অমিতাভ থমকে তারপর আড়ষ্ট হয়ে গেল কমলকে খাটে বসে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে দেখে।

"পাঁউরুটি! কেন, ভাত রান্না হয়নি?"

"আজ শরীরটা ভাল নয়, তাই—"

"এতগুলো? এ তো প্রায় দু'জনের মত দেখছি!"

"কালকের জন্যও এনে রাখলুম।"

কমল গম্ভীর মুখে আবার কয়েকটা পাতা উলটিয়ে গেল। অমিতাভ সন্তর্পণে ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল।

"ফুটবল যারা খেলে তাদের তুমি ঘৃণা করো। যেমন আমায় করো।" কমল অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, "তোমার মা'র মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী ভেবে তুমি কখনো আমায় সহজভাবে নিতে পারনি, বাপ-ছেলের স্বাভাবিক সম্পর্ক আমাদের যেন হয়নি।

হ্যাঁ, স্বীকার করি, তাকে অবহেলা করে আমি ফুটবলকেই বড় করে দেখেছি। আমি শুধু জানতে চাই, আমার প্রতি ঘৃণাটা তোমার আছে কি এখনো ?"

অমিতাভ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এসব কথা বলছেন কেন ?"

"কৌতূহলে। তোমার কি কখনো কৌতূহল হয় না, খেলার জন্য তোমার মাকে অগ্রাহ্য করেছে যে লোক, তার খেলা একবারও দেখার ?"

"হয়, কিন্তু ওই কারণে নয়। ফুটবলকে এত ভালবেসে শেষে অপমান ও তাচ্ছিল্য নিয়ে খেলা থেকে সরে যাচ্ছে যে লোকটি, তার খেলা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

কমল তীব্র চোখে তাকাল ছেলের দিকে। অমিতাভ অচঞ্চল।

"শুধু এইজন্য ইচ্ছে করে ?"

"না। খেলাকে ভালবাসলে মানুষ কি পরিমাণ পাগল হয়, সেটা দেখতে দেখতেই আমার কৌতূহল জেগেছে।"

"কাকে দেখে, সলিলকে ?"

অমিতাভ চমকে উঠে কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় তার সারা মুখে।

"তুমি ওকে আশ্রয় দিয়েছ কেন ?" কমল কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল।

"ও আমাকে অবাক করেছে। সেদিন অমানুষিক মার খাবার পর বলেছিল, কমলদার মত আমার মাথায় দাগ তৈরী হবে না, আমার মাথা ফাটেনি। এই বলে ও কেঁদেছিল। ও আশ্রয় চেয়েছিল, আমি আশ্রয় দিয়েছি। এই ঘরে। ভোরে বেরিয়ে যায়, দুপুরে আসে, বিকেলে বেরিয়ে রাত্রে

আসে। ও নিজের বাপ-মা ভাই-বোনদের ত্যাগ করেছে। ওর মধ্যে আমি অনেক কিছু না-বোঝা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি।"

"কি বুঝেছ, কি বুঝেছ?" কমল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল। "আমার কোন দোষ ছিল না। খেলা শুধু শারীরিকই নয়, একটা মানসিক ব্যাপারও—সেটা বুঝেছ কি?"

"আপনার খেলা দেখার পর সেটা বুঝব।"

"তুমি আমার খেলা দেখবে!" কমল হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাতটা নামিয়ে নিল। অমিতাভ মাথাটা কাত করল।

কমল পরদিন অফিস থেকে শোভাবাজার টেণ্টে ফোন করল, "আমি খেলব, যাত্রীর সঙ্গে খেলাটায়।"

॥ ষোল ॥

কাঁসর, শাঁখ, পটকা নিয়ে যাত্রীর সমর্থকরা ইস্টবেঙ্গল মাঠের সবুজ গ্যালারী ছেয়ে রয়েছে। দশ গজ পর পর হাতে উড়ছে যাত্রীর পতাকা। যুগের যাত্রী আজ লীগ চ্যামপিয়ন হবে। যাত্রীর ইতিহাসে প্রথম। আর দু'টি পয়েন্ট তাদের দরকার। যাত্রীর সমান খেলে ইস্টবেঙ্গল এক পয়েণ্টে পিছিয়ে, মোহনবাগান তিন পয়েণ্টে, মহমেডান ছয় পয়েণ্টে। প্রত্যেকেরই একটি করে খেলা বাকি। যাত্রীকে আর ধরা যাবে না। যদি আজ যাত্রী ড্র করে এক পয়েন্ট খোয়ায়, তা হলে ইস্টবেঙ্গল সমান-সমান হবার সুযোগ পাবে, কেননা তাদের শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। প্রথম খেলায় টেলিগ্রাফকে চার গোলে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

গ্যালারীতে একজন দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, "যাত্রী আজ যদি হেরে যায়! খেলার কথা তো কিছুই বলা যায় না।"

অবশ্য লোকটি কয়েক মুহূর্ত পরেই বুদ্ধিমান হয়ে গেল এবং সবাইকে শুনিয়ে বলল, "পি সি সরকার কিংবা পেলে ছাড়া যাত্রীকে আজ হারাবার ক্ষমতা কার আছে! আগের ম্যাচে কিভাবে শোভাবাজার পাঁচ গোল খেয়েছিল মনে পড়ে?"

"শোভাবাজারের সেই টিমই খেলবে।" খুব বোদ্ধার মত আর একজন বলল, "সিজন যত শেষ হয়ে আসে, বর্ষা নামে, ছোটা টিম ততই টায়ার্ড হয়, খারাপ খেলে। আমার তো

মনে হয়, রেকর্ড গোল দিয়ে যাত্রীর লীগ চ্যামপিয়ন হওয়ার আজই সুযোগ।"

"দাদা, আগের ম্যাচে তো কমল গুহ খেলেছিল, আজও খেলবে কি?"

"কে জানে? অনেকদিন তো কাগজে নাম-টাম চোখে পড়েনি। আর খেললেই বা কি আসে যায়?"

"জানেন তো যাত্রী ছেড়ে যাবার সময় কমল গুহ কি বলেছিল?"

"আরে রাখুন ওসব বলাবলি। অনুপম আর প্রসূন আজ ওর পিণ্ডি চটকে ছাড়বে। দম্ভ নিয়ে মশাই ক'জন তা রাখতে পেরেছে? রাবণ পারেনি, দুর্যোধন পারেনি, হিটলার পারেনি, আর কমল গুহ পারবে?"

আজ শোভাবাজারের সমর্থক শুধু ইস্টবেঙ্গল মেম্বার গ্যালারীতে। তাদের মনে একটা ক্ষীণ আশা—যদি যাত্রী হারে। হারলে, ইস্টবেঙ্গলের চ্যামপিয়ন হওয়া ওই পেলে বা পি সি সরকারও বন্ধ করতে পারবে না।

"অসম্ভব, হতি পারে না। যাত্রীর হার হতি পারে না। শোভাবাজারের আছেডা কে? লীগটা লইয়াই গেল শ্যাস পর্যন্ত।" কপালে করাঘাত হল।

"চ্যাঁচাইয়া যদি জেতন্ যায় তো আজ কল্জে ফাটাইয়া দিমু। কি কস্?"

"তাই দে।"

"নিচ্চয়, আজ্ঞ যেমন কইরা হোক জেতাইতে হইবই। ক্যান্, স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিন জেতাই নাই ইস্ট-বেঙ্গলেরে।"

"আরে মহাই, চেঁচিয়ে জেতাবেন স'বাজার সে টিম নয়।

পয়াকড়ি দিয়ে দু-চারটে প্লেয়ারকে যাত্রী ঠিক ম্যানেজ করে রেকেছে। ষোলো বচ্চরতো খেলা দেখচি।"

"ছারপোকা! আমাগো গ্যালারীতে?"

"ছাইড়া দে। অগো আর আমাগো আজ কমন্ ইন্টারেস্ট। ইংরাজি বোঝোস তো?"

"চার বছ্ছর আই এছ্ছি পড়ছি। ইন্টারেস্ট মানে সুদ তা আর জানি না?"

পাশেই এরিয়ানের গ্যালারীর অংশে রয়েছে যুগের যাত্রীর মেম্বাররা। সেখানে হৈ হৈ পড়ে গেছে বিপুল কলেবর 'ফিল্ড-মার্শাল'কে দেখে। বিরাট গোঁফওলা লোকটি, চারটি সিগারেট মুঠো করে রাখা পাঁচ আঙুলের ফাঁকে। এক একটি টান দিচ্ছে আর মুখ থেকে পাটকলের চিমনীর মত ধোঁয়া বার করছে। যাত্রী ম্যাচ জেতার পর 'ফিল্ড-মার্শাল' এইভাবে সিগারেট খায়। আজ খেলা শুরুর আগেই খাচ্ছে।

'ফিল্ড-মার্শালে'র পিছন পিছন দু'টি চাকর বিরাট এক হাণ্ডা নিয়ে গ্যালারীতে এসেছে। ওতে আছে ১৫ কিলো রান্না করা মাংস। খেলা শেষে ভাঁড়ে বিতরণ করা হবে। হুটোপুটি পড়ে গেল হাণ্ডার কাছাকাছি থাকার জন্য।

"বড় খিদে পেয়েছে দাদা, ব্যাপারটা অ্যাডভান্সই চুকিয়ে ফেলুন না। রেজাল্ট তো জানাই আছে, তবে আর আমাদের কষ্ট দেওয়া কেন?"

"নৌ নৌ। এখন নয়।" ফিল্ড-মার্শাল দু'হাত তুলল। "অফিসিয়াল ভিকট্রির পর।"

মাঠের এক কোণায় গ্যালারীতে রয়েছে শোভাবাজার স্পোর্টিংয়ের ডে-স্লিপ নিয়ে যারা এসেছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই অবশ্য মনে মনে যাত্রীর সমর্থক। বিপুল ঘোষ

আজ প্রথম মাঠে এসেছে কমলের কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে। তার পাশেই বসেছে অমিতাভ। চুপচাপ একা। সলিল তাকে স্লিপ দিয়েছে। ফুটবল মাঠে আজই প্রথম আসা। ওদের পিছনে বসে অরুণা আর পিন্টু। গতকাল কমল গেছল ওদের বাড়িতে; পল্টু মুখার্জির ছবির সামনে চোখ বুঁজে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বিড়বিড় করে কিছু বলে। পিন্টুও তার দেখাদেখি প্রণাম জানায়। পিন্টুই বায়না ধরে, কমলমামার খেলা সে দেখবে।

গ্যালারীতে পিন্টু অধৈর্য হয়ে ছটফট করে, কখন টিম নামবে! অরুণা ছোটবেলায়, পিন্টুরই বয়সে, বাবার সঙ্গে মাঠে এসে দেখেছে কমলের খেলা, শুধু মনে আছে, সারা মাঠ উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কমলকে নিয়ে। আজ তারও প্রচণ্ড কৌতূহল। বিপুল ঘোষ ঘড়ি দেখে পাশের অমিতাভকে বলল, "খেলা ক'টায় আরম্ভ বলতে পারেন?" অমিতাভ মাথা নাড়ল। শোভাবাজারকে কতকটা বিদ্রূপ জানাতেই প্রচণ্ড শব্দে মাঠের মধ্যে পটকা পড়ল, তারপর পিন্টু প্রবল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ওই যে কমলমামা।"

কয়েক দিন ধরে কমল বারোটি ছেলেকে নিয়ে রীতিমত ক্লাস করেছে তার শোবার ঘরে। মেঝেয় খড়ি দিয়ে মাঠ এঁকে, তার মধ্যে ঢিল সাজিয়ে (ঢিলগুলি প্লেয়ার) সে যাত্রীর এক একটা মুভ দেখিয়ে কি ভাবে সেগুলো প্রতিহত করতে হবে বুঝিয়েছে। ওরা গোল হয়ে ঘিরে বসে গভীর মনোযোগে শুনেছে। যাত্রীর অ্যাটাক প্রধানত কাকে ঘিরে, কোথা থেকে বল আসে, কি কি ফন্দি এঁটে ওরা স্ক্যাটিং স্পেস তৈরী করে, পাহারা দেওয়া ডিফেণ্ডারকে সরাবার জন্য কি

ভাবে ওরা বল-ছাড়া দৌড়োদৌড়ি করে, ওভারল্যাপ করে ওদের ব্যাক কি ভাবে ওঠে, কমল ওদের দেখিয়েছে টিলগুলি নাড়াচাড়া করে। তারপর বুঝিয়েছে কার কি কর্তব্য। যাত্রীর প্রতিটি প্লেয়ারের গুণ এবং ত্রুটি এবং শোভাবাজারের কোন্ প্লেয়ারকে কি কাজ করতে হবে বার বার বলেছে। খেলার দিন সকালেও সে সকলকে ডেকে এনে শেষবারের মত বলে, "চারজন ব্যাকের পিছনে থাকব আমি। যখনই দরকার তখনই প্রত্যেক ডিফেণ্ডারকে কভার দেবো। ডিফেণ্ডাররা নিজের নিজের লোককে ধরে রাখবে। মুহূর্ত দেরী না করে ট্যাকল করবে। বল ওরা কণ্ট্রোলে আনার আগেই চ্যালেঞ্জ করবে। বিশেষ করে প্রসূনকে। যেখানে ও যাবে সলিল ছায়ার মত সঙ্গে থাকবে। অনুপমকে দেখবে স্বপন। চারজন ব্যাকের সামনে থাকবে শম্ভু। প্রত্যেকটা পাস মাঝপথে ধরার চেষ্টা করবে, যেন যাত্রীর কোন ফরোয়ার্ডের কাছে বল পৌঁছতে না পারে। অ্যাটাক কোথাও থেকে শুরু হচ্ছে দেখামাত্র গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে। শম্ভুর সামনে তিনজন হাফব্যাক থাকবে। যাত্রীর অ্যাটাক শুরু হবার মুখেই ঝাঁপিয়ে পড়বে, আবার দরকার হলে নেমে এসে হেল্প করবে, আবার কাউন্টার-অ্যাটাকে বল নিয়ে এগিয়ে যাবে। আর যাত্রীর পেনাল্টি বক্সের কাছে থাকবে গোপাল। মোট কথা, আমাদের ছকটা হবে ১—৪—১—৩—১।"

"কমলদা, আমি কিন্তু ওদের দু-একটাকে বার কোরবই।" শম্ভু গোঁয়ারের মত বলেছিল।

কমল কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, "ওদের একজনকে বার করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও বেরিয়ে যেতে

হবে। তাতে ক্ষতি হবে শোভাবাজারেরই। শম্ভু, আজ সব থেকে দায়িত্বের কাজ তোমার উপর। তুমি কি দায়িত্বের ভয়ে পালিয়ে যেতে চাও?"

"কে বলল?" শম্ভু লাফিয়ে উঠল। চোখ দিয়ে রাগ ঠিকরে পড়ল। দেয়ালে ঘুষি মেরে সে বলল, "আমি পালাব, আমি পালিয়ে যেতে চাই? আমার বাপ দেশ ভাগ হতে পালিয়ে এসেছিল। শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে আমি জন্মেছি কমলদা, আমার মা মরেছে উপোস দিয়ে, বড় ভাই মরেছে খাদ্য আন্দোলনে গুলি খেয়ে। আমি চুরি-চামারি অনেক করেছি। আজ ছিঁড়ে খাবো সবাইকে।"

কমল পর পর সকলের মুখের দিকে তাকায়, তারপর ফিসফিসে গলায় বলে, "আজ শোভাবাজার লড়বে।"

ওরা চুপ করে শুধু কমলের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল।

॥ সতর ॥

তারপর শোভাবাজার লড়াই শুরু করল।

কিক্ অফের সঙ্গে সঙ্গে অনুপম ছুটতে শুরু করল আর প্রসূন ডান টাচ লাইনে লম্বা শটে বল পাঠাল, ছোটার মাথায় অনুপম বলে পা দেওয়া মাত্র স্বপন বুলডোজারের মত এগিয়ে এসে ধাক্কা মারল। ফাউল। গ্যালারীতে বিশ্রি কথাবার্তা আর চীৎকার শুরু হয়ে গেল। যাত্রীর রাইট ব্যাক ফ্রি কিক্ করে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে বল ফেলামাত্র প্রাণবন্ধু হেড দিয়ে ক্লিয়ার করার জন্য উঠল, আর প্রায় ১৫ গজ ছুটে এসে ভরত তার মাথার উপর থেকে বলটা তুলে নিয়ে একগাল হাসল।

"ভরত, হচ্ছে কি, গোলে দাঁড়া।" কমল ধমক দিল।

কিক্ করে বলটা মাঝমাঠে পাঠিয়ে ভরত বলল, "কমলদা, পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে কাউকে আজ মাথায় বল লাগাতে দেবো না।"

যাত্রী শুরুতেই ধাক্কা দিয়ে তারপর ক্রমশ এগিয়ে এসে শোভাবাজারের পেনাল্টি এরিয়াকে ছয়জনে ঘিরে ধরল এবং দুই উইং ব্যাকও উঠে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। শোভাবাজারের গোপাল ছাড়া আর সবাই গোলের মুখে নেমে এসেছে। কমল বিপদের গন্ধ পেল। আঠারো জন লোক একটা ছোট জায়গার মধ্যে গুঁতাগুঁতি করতে করতে হঠাৎ কখন কে ফাঁক পেয়ে গোলে বল মেরে দেবে এবং এইরকম

অবস্থায় সাধারণত ভিড়ের জন্য গোলকীপারের দৃষ্টিপথ আড়াল থাকে। তা ছাড়া ট্যাকল করার আগে কোনরকম বিচার-বোধ ব্যবহার না করায় এবং যথেষ্ট স্কিল না থাকায় শোভা-বাজারের ডিফেণ্ডাররাও বেসামাল হতে শুরু করেছে।

এতটা ডিফেন্সিভ হওয়া উচিত হয়নি। কমল দ্রুত চিন্তা করে যেতে লাগল। শুধু গোয়ার্তুমি সাহস বা দমের জোরে একটা স্কিল্ড অ্যাটাককে ঠেকানো যায় না। কাউন্টার-অ্যাটাক চাই। বল নিয়ে উঠতে হবে। গোপাল উঠে আছে কিন্তু ওকে বল দিয়ে কাজ হবে না। একা বল নিয়ে দুটো স্টপারকে কাটিয়ে বেরোনোর ক্ষমতা ওর নেই। বল আবার ফিরে আসবে।

প্রাণবন্ধুর একটা মিসকিক্ কমল ধরে ফেলল। সামনেই যাত্রীর আব্রাহাম। কোমর থেকে একটা ঝাঁকুনির দোলা কমলের শরীরের উপর দিকে উঠে যেতেই আব্রাহাম টলে পড়ল। বল নিয়ে কমল পেনাল্টি এরিয়া পার হল।

"ওঠ্ সলিল।"

কমলের পিছনে প্রসূন, অনুসরণ করছে সলিল। কমলের ডাকে সে এগিয়ে এল। যাত্রীর হাফ-ব্যাক অমিয় এগিয়ে আসতেই কমল বলটা ঠেলে দিল সলিলকে। দ্রুত শোভা-বাজারের চারজন উঠছে। বল ডান থেকে বাঁ দিকে, আবার ঘুরে ডান দিকে এল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীর কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে রুদ্রর কাছ থেকে বল কেড়ে নিল আনোয়ার।

কমল এগিয়ে এসেছে। প্রায় দশ মিনিট যাত্রীর চাপ তারা ধরে রেখেছিল। খেলাটাকে মাঝমাঠে আটকে রেখে যাত্রীর গতি মন্থর করাতে হবে। কমল বল ধরে পায়ে রাখতে শুরু করল। রুদ্র, সত্য আর দেবীদাস মাঠের

মাঝখানে, শম্ভু ঠিক ওদের পিছনে। তার কাছে বল পাঠিয়ে কমল চার ব্যাকের পিছনে পেনাল্টি এরিয়া লাইনের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যাত্রীর কে কোথায় কি ভাবে নড়াচড়া করছে।

আঠার মত লেগে আছে শোভাবাজারের চারটি ব্যাক যাত্রীর চার ফরোয়ার্ডের সঙ্গে। অনুপমের কাছে চারবার বল এসেছে এবং প্রতিবার সে বলে পা লাগাবার আগেই স্বপন ছিনিয়ে নিয়েছে। বল যখন যাত্রীর বাম কর্ণার ফ্ল্যাগের কাছে, অনুপম তখন শোভাবাজারের রাইট হাফের কাছাকাছি ডান টাচ লাইন ঘেঁষে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর পাঁচ হাত দূরে স্বপন। অনুপম হাঁটতে লাগল সেণ্টার লাইনের দিকে, ওর পাশাপাশি চলল স্বপনও। অনুপম হঠাৎ ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল, স্বপনও ওর সঙ্গে ফিরে এল। গ্যালারীতে যাত্রীর সমর্থকরা পর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে হেসে উঠল। অনুপম ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নিমাইয়ের জায়গায় ছুটে গেল, স্বপনও। যতবার বল তার দিকে আসে, স্বপন হয় টাচ লাইনের বাইরে ঠেলে দেয়, নয়তো মাঠের যেখানে খুশি কিক্ করে পাঠায়। অনুপম দু'বার স্বপনকে কাটিয়েই দেখে, কমল স্বপনকে কভার করে এগিয়ে এসে তার পথ জুড়ে আছে। কি করবে ভেবে ঠিক করার আগে স্বপনই ঘুরে এসে ছোঁ মেরে বলটা নিয়ে গেল।

শম্ভু পাগলের মত মাঝমাঠটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যাত্রীর ফরোয়ার্ডদের উদ্দেশ্যে পিছন থেকে পাঠানো বল ধরার জন্য, ডাইনে-বামে যেখান থেকেই আক্রমণ তৈরী হয়ে ওঠার গন্ধ পেয়েছে, সেখানেই ছুটে যাচ্ছে

বুলডগের মত। সব সময়ই যে সফল হচ্ছে তা নয়, কিন্তু ওর জন্য বল নিয়ে যাত্রীর কেউ সহজে উঠে আসতে পারছে না। যদিও বা ওয়াল-পাস করে উঠে আসে, প্রাণবন্ধু নয়তো সলিল এগিয়ে আসে চ্যালেঞ্জ করতে।

প্রসূন পিছিয়ে নেমে এসেছে। সলিলও তার সঙ্গে যাচ্ছিল, কমল বারণ করল।

"মাঝমাঠে যত ইচ্ছে প্রসূন খেলুক, তুই এখানে থাক। যখনই উঠে আসবে আবার লেগে থাকবি।"

তারপরই যাত্রীর দুই উইং ব্যাক দু'দিক থেকে উঠতে শুরু করল। কমল বিপদ দেখতে পেল। নিমাই, আব্রাহাম আর অনুপম ছোটাছুটি করে ছড়িয়ে যাচ্ছে বলাই, প্রাণবন্ধু আর স্বপনকে নিয়ে। প্রসূন বল নিয়ে উঠছে, দু'পাশ থেকে উইং ব্যাক দু'জন। কমল দু'দিকে নজর রাখতে লাগল কোন্ দিকে প্রসূন বল বাড়িয়ে দেয়।

চার ব্যাকের পিছনে মাঝামাঝি জায়গায় কমল দাঁড়াল। প্রসূন দেবীদাসকে কাটাল, শম্ভুর স্লাইডিং ট্যাকল ব্যর্থ হল। সলিল এগোচ্ছে। প্রসূনের বাঁ কাঁধ সামান্য ঘুরেছে গোলের দিকে, এবার ডানদিকে বল বাড়াবে। কমল তার বাঁ দিক চেপে সরে গিয়ে উঠে আসা রাইট ব্যাকের দিকে নজর দিল আর প্রসূন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় শরীর মুচড়ে তার বাঁ দিকে বল পাঠাল, যেখানে লেফট ব্যাক বাঁ দিক থেকে ফাঁকায় উঠে এসেছে।

প্রায় পঁচিশ হাজার কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—গো-ও-ল গো-ও-ল। সেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে জ্বালা ধরানো কোন খবর ছিল যা কমলের স্নায়ুকেন্দ্রে মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটাল। বাঁ দিকে ঝোঁকা দেহভারকে সে চিন্তাবোধের ক্ষিপ্রতায়

ডান দিকে ঘুরিয়ে ছুটে এল লেফট ব্যাকের সামনে। প্রায় ১২ গজ দূরত্ব গোল থেকে। শট নিলে নিশ্চিত গোল। হঠাৎ সামনে কমলকে দেখে সে শট নিতে গিয়েও নিতে পারল না। পলকের মধ্যে কমল বলটা কেড়ে নিয়ে যখন রুদ্রর কাছে পাঠাল তখন গ্যালারীর চীৎকার চাপা হতাশায় কাতরে উঠেছে। প্রায় ৩০ মিনিট খেলা হয়ে গেল, এখনো গোল হল না! শোভাবাজার একবারও যাত্রীর গোলের দিকে যায়নি।

কিন্তু হাফ-টাইমের কয়েক সেকেণ্ড আগে শম্ভুর পা থেকে ছিটকে যাওয়া বল পেয়ে গোপাল অভাবিত যাত্রীর গোলের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় আনোয়ার ও অমিয়কে পিছনে ফেলে। গোলকীপার শ্যাম এগিয়ে এসেছে। গোপাল প্রায় চোখ বুঁজেই শট নেয়। শ্যামের ঝাঁপানো হাতের নাগাল পেরিয়ে বল ক্রসবারে লেগে মাঠে ফিরে এল।

সারা মাঠ বিস্ময়ে নির্বাক। অকল্পনীয় ব্যাপার, শোভা-বাজার গোল দিয়ে ফেলেছিল প্রায়। বিস্ময়ের ঘোর কাটল রেফারীর হাফ-টাইমের বাঁশিতে। মাঠের সীমানার বাইরে এসে শোভাবাজারের ছেলেরা একে একে বসে পড়ল। কৃষ্ণ মাইতি জলের গ্লাস আর তোয়ালে নিয়ে ব্যস্ত। প্লেয়াররা কেউ কথা বলছে না। পরিশ্রান্ত দেহগুলো ধুঁকছে। অবসন্নতায় পিঠগুলো বেঁকে গেছে।

কৃষ্ণ মাইতি হাত নেড়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে বলল, "এবার লং পাসে খেলে যা, শর্ট পাস বন্ধ কর! সত্য, তুই অত নেমে খেলছিস কেন, উঠে খেল। সলিল, আরো রোবাস্ট্‌লি খেলতে হবে, বার কয়েক পা চালা,



কমল হাত তুলে কৃষ্ণ মাইতিকে চুপ করতে ইশারা করল।

আব্রাহামটা দারুণ ভীতু।”

কমল হাত তুলে কৃষ্ণ মাইতিকে চুপ করতে ইশারা করল, “এখন ওদের কিছু বলবেন না।”

সলিল বলল, “কমলদা, ওটা আমারই দোষ ছিল। প্রসূন পাসটা অত আগেই দেবে বুঝতে পারিনি, নয়তো আগেই ট্যাকল করতুম। আপনি না থাকলে গোল হয়ে যেত।”

কমল কথাগুলো না শোনার ভান করে গ্যালারীর শেষপ্রান্তে তাকাল। চেষ্টা করল একটা মুখ খুঁজে বার করতে। ব্যর্থ হয়ে বলল, “অমিতাভ এসেছে কি ?”

সলিল বলল, “হ্যাঁ, ওই তো। ওই যে একজন মেয়ে-ছেলে বসে আছে—ঠিক তার সামনে। বল আনতে গিয়ে আমি দেখেছি।”

কমল আবার তাকাল।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে থমথমে ভাব। কেউ কেউ উত্তেজিত। ‘অনুপমের এ কি খেলা!’ ‘ডিফেন্স যখন ক্রাউডেড করেছে তা হলে ওদের টেনে বার করে ফাঁকা করুক!’ ‘প্রসূন নিজে গোলে না মেরে পাস দিতে গেল কেন ?’

‘শম্ভুর ট্যাকলিং প্রত্যেকটা ফাউল, রেফারী দেখেও দেখছে না। আব্রাহামকে যে অফসাইডটা দিল দেখেছেন তো ?’ ‘একবার বল এনেছে তাতেই গোল হয়ে যাচ্ছিল; চলে না, আনোয়ার-কানোয়ার আর চলে না।’

কমল উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল। কানে এল কচি গলায় পিন্টু ডাকছে, “কমলমামা, কমলমামা, এই যে আমরা এখানে।”

॥ আঠার ॥

রেফারী বাঁশি বাজাল।

"মনে আছে তো, শোভাবাজার আজ লড়বে!" মাঠে নামার সময় কমল মনে করিয়ে দিল। ওরা কথা বলল না।

কমল আশা করেছিল যাত্রী ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সাবধানে ওরা মাঝমাঠে বল রেখে খেলছে। মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পর অনুপম বল পেয়ে কর্ণার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটে থমকে স্বপনকে কাটিয়ে নিয়ে ঢুকতে গিয়ে কমলের কাছে বাধা পেল। সেণ্টার করল সে। ভরত সহজেই আব্রাহামের মাথা থেকে বল তুলে নিল।

"স্বপন, কি ব্যাপার! অনুপম বিট করে গেল?" কমল কথাগুলো বলতে বলতে এগিয়ে গেল। আবার অনুপম এগোচ্ছে বল নিয়ে।

স্বপন এবারও পিছনে পড়ে ঘুরে এসে আর চ্যালেঞ্জ করল না। কমল বুঝে গেল স্বপন আর পারছে না। এবং লক্ষ্য করল, বলাই এবং প্রাণবন্ধুও মন্থর হয়ে এসেছে। সলিলের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ এখনো দেখা দেয়নি। শম্ভু মাঝমাঠে দোর্দণ্ড হয়ে রয়েছে। যেখানে বল সেখানেই ছুটে যাচ্ছে। দেবীদাস আর সত্য বল দেওয়া-নেওয়া করে যাত্রীর হাফ লাইন পর্যন্ত বার কয়েক পৌঁছতে পেরেছে।

ফাউল করেছে শম্ভু। যাত্রীর রাইট ব্যাকের বুকে পা তুলে দিয়েছে। সে কলার ধরেছে শম্ভুর। গ্যালারী

থেকে কাঠের টুকরো আর ইট পড়ছে মাঠে শম্ভুকে লক্ষ্য করে। এর এক মিনিট পরেই শম্ভুকে মাঠের বাইরে যেতে হল। আব্রাহাম, অমিয় আর শম্ভু একসঙ্গে বলের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে এক সঙ্গেই মাটিতে পড়ে গেল। দু'জন উঠে দাঁড়াল, শম্ভুকে ধরাধরি করে বাইরে আনা হল। এবং মিনিট তিনেক পর যখন সে মাঠে এল তখন খোঁড়াচ্ছে।

মাঝমাঠে এখন যাত্রীর রাজত্ব। শম্ভু ছুটতে যায় আর যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে।

"কমলদা, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। আমাকে শেষ করে দিয়েছে। ওদের একটাকে নিয়ে বরং আমি বেরিয়ে যাই।"

"না। তুই বোস। রতনকে নামতে বল।"

"আমি বরং প্রসূনকে নিয়ে—ও ভাল খেলছে।"

"খেলুক। খেলতে হবে ওকে।" কমলের রগের শিরা দপদপ করে উঠল। "না খেললে কমল গুহকে টপকানো যাবে না।"

শম্ভু বসল এবং তৃতীয় ডিভিশন থেকে এই বছরেই আসা নতুন ছেলে রতন নামল। তখন গ্যালারীতে পটকা ফাটল। যাত্রীর আক্রমণে আটজন উঠে এল এবং ক্লান্ত শোভাবাজার সময় গুনতে লাগল কখন গোল হয়। এবং—

একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মত কমল গুহ তখন শোভাবাজারের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে শাখা বিস্তার করে দিল। কখনো সে বন্য মহিষ কখনো বনবিড়াল, কখনো গোখরো সাপ। শোভাবাজার পেনাল্টি এলাকাটা ভয়ঙ্কর করে তুলল কমল তার ক্রুদ্ধ চতুর হিংস্র বিচরণে। একটার পর একটা আক্রমণ আসছে, প্রধানত সলিলকে নিয়ে কমল

সেগুলো রুখে যাচ্ছে। আর গ্যালারীতে অশ্রান্ত গর্জন ক্রুদ্ধ-হতাশায় আর্তনাদে পরিণত হচ্ছে।

এইবার, এইবার যাত্রী, আমি শোধ নেব। কমল নিজের সঙ্গে কথা বলে চলে। আমার মাথা নোয়াতে পারোনি, আজও উঁচু করে বেরোব মাঠ থেকে। গুলোদা, রথীন, এদের সব ব্যঙ্গ সব বিদ্রূপ আজ ফিরিয়ে দেবো। বল আনছে প্রসূন, এগোক, এগোক, সলিল আছে। ওর পিছনে আমি। আহ্ লেফট উইং নিমাইকে দিল, বলাই চেজ করছে, ওর পিছনে আমি আছি।

কমলের সামনে বল নিয়ে নিমাই থমকে দাঁড়াল। ডাইনে ঝুঁকল, বাঁয়ে হেলল। কমল নিস্পন্দের মত, চোখ দু'টি শুধু বলের দিকে স্থির। নিমাই কাকে বলটা দেওয়া যায় দেখার জন্য মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতেই ছোবল দেবার মত কমলের ডান পা নিমাইয়ের হেফাজত থেকে বলটা সরিয়ে নিল।

কমল বল নিয়ে উঠছে। আয়, আয় কে আসবি, গুলোদা, সরোজ, রথীন, রণেন দাস—কোথায় অনুপমের ভক্তরা—আয়, কমল গুহর পায়ে বল, আয় দেখি কেড়ে নে।

রাইট হাফকে কাটিয়ে কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। সাইড লাইনের ধারে বেঞ্চে রথীন। ওর সুশ্রী মুখটা যন্ত্রণায় মুচড়ে রয়েছে। কমল একবার মুখ ফিরিয়ে রথীনের দিকে তাকিয়ে হাসল। আজও জ্বালাচ্ছি তোদের। বছরের পর বছর আমি জ্বলেছি রে। আমাকে বঞ্চিত করে যাত্রী তোকে ইণ্ডিয়ার জার্সি পরিয়েছে, আমাকে প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে যাত্রী, আমাকে সাধারণ প্লেয়ারের মত বসিয়ে রেখে অপমান করেছিস···কমল মাঠের মধ্যে সরে আসতেই, দু'জন

এগিয়ে এল চ্যালেঞ্জ করতে। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে কমল দু'জনের মধ্যে দিয়ে পিছলে এগিয়ে গেল, বলটা আঠার মত পায়ে লেগে রয়েছে···অমিতাভর মায়ের মৃত্যুর খবরটা যাত্রী আমাকে দেয়নি রে রথীন। ট্রফি জিততে কমল গুহকে দরকার, তাই খবরটা চেপে গেছল।······আর একজন সামনে এগিয়ে এল কমলের। ডান দিকে সরে যেতে লাগল কমল। বল নিয়ে দাঁড়াল। গোল প্রায় তিরিশ গজ। বলটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে কমল শট নিল। নিখুঁত মাপা শট। বার ও পোস্টের জোড় লক্ষ্য করে বলটা জমি থেকে উড়ে যাচ্ছে। গ্যালারীতে হাজার হাজার হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ মুহূর্তের জন্য তখন বন্ধ হয়ে গেল। শ্যাম লাফিয়ে উঠে চমৎকার ভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে বলটা বারের উপর তুলে দিতেই মাঠের চারধারে আবার নিঃশ্বাস পড়ল।

কর্ণার। শোভাবাজারের আজ প্রথম। যাত্রী পেয়েছে আটটা। তার মধ্যে সাতটাই ভরত লুফে নিয়েছে। বল বসাচ্ছিল দেবীদাস। সত্য ছুটে এসে তাকে সরিয়ে দিল। যাত্রীর ছ'জন গোলের মুখে। শোভাবাজারের পাঁচজনকে তারা আগলে রেখে দাঁড়াল।

সত্য কিক নিল। মসৃণ গতিতে বলটা রামধনুর মত বক্রতায় গোলমুখে পড়ছিল। গোপাল লাফাল। তার মাথার উপর থেকে পাঞ্চ করল শ্যাম। প্রায় পনেরো গজ দূরে গিয়ে বল পড়ছে। সেখানে দেবীদাস। দু'জন তার দিকে ছিটকে এগোল।

"দেবী!"

বাঁ পাশ থেকে ডাকটা শুনেই দেবীদাস বলটা বাঁ দিকে ঠেলে সরে গেল। পিছন থেকে ঝলসে বেরিয়ে এল একটা

চেহারা। তার বাঁ পা-টা উঠল এবং বলে আঘাত করল। বাম পোস্ট ঘেঁষে বলটা যাত্রীর গোলের মধ্যে ঢুকল। এমন অতর্কিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে খেলোয়াড়রা শুধু অবিশ্বাসভরে আঘাতকারীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কয়েক সেকেণ্ড চোখ সরাতে পারল না।

যাত্রীর মেম্বারদের মধ্যে কথা নেই। শুধু একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল মাত্র, "অত মাংস খাবে কে এবার!"

বিপুল ঘোষ হতভম্ব হয়ে অমিতাভকে বলল, "য়্যাঁ, যুগের যাত্রী গোল খেয়ে গেল! কে গোলটা দিল?"

অমিতাভ গলার কাছে জমে ওঠা বাষ্প ভেদ করে অস্ফুটে শব্দগুলো বার করে আনল, "কমল গুহ।" তারপর লাজুক স্বরে যোগ করল, "আমার বাবা।"

ঝাঁপিয়ে পড়ল যাত্রী শোভাবাজারের গোলে। চার মিনিট বাকি। পর পর তিনটি কর্ণার, দু'টি ফ্রি কিক্ যাত্রী পেল। আব্রাহামের চোরা ঘুষিতে বলাইয়ের ঠোঁট ফাটল। কিন্তু সেই বৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটি সব ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করে রাখল তার পিছনের গোলটিকে।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে মাঠের মধ্যে দৌড়ে এল শম্ভু। "আমি সেরে গেছি, আমি সেরে গেছি কমলদা। আমার আর ব্যথা নেই।"

প্রথম কমলের দুই হাঁটু জড়িয়ে তাকে উপরে তুলল সত্য। তারপর কি ভাবে যেন চারটে কাঁধ চেয়ার হয়ে কমলকে বসিয়ে নিল। ইস্টবেঙ্গল মেম্বার গ্যালারী উত্তেজনায় বিস্ময়ে টগবগ করছে।

কাঁধের উপর কমলকে তুলে ওরা মাঠের বাইরে এল। কৃষ্ণ মাইতির গলা ধরে গেছে চীৎকার করে। "কমল, বল্

বল্, আমি প্লেয়ার চিনি কিনা বল্। নিজের রিস্কে সব অপোজিসন অগ্রাহ্য করে তোকে খেলিয়েছিলুম আগের ম্যাচে, বল্ ঠিক বলছি কি না।"

কমলের মস্তিষ্ক ঘিরে এখন যেন একটা কালো পর্দা টাঙানো। কিং ঘটছে, কে কি বলছে তার মাথার মধ্যে ঢুকছে না, কোন আবেগ বেরোতেও পারছে না। ক্লান্তিতে দু' চোখ ঝাপসা। তার শুধু মনে হচ্ছে, কিছু অর্থহীন শব্দ আর কিছু মানুষ তার চারপাশে কিলবিল করছে। কমল ভারবাহী একটা ক্রেনের মত নিজের শরীরটা নামিয়ে দিল ভূমিতে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর টপটপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল ঘাসের উপর। কেন পড়ছে তা সে জানে না।

অতি যত্নে তার পা থেকে বুট খুলে দিচ্ছে কে! কমল মাথা ফিরিয়ে দেখল, সলিল। গ্যালারীর দিকে কমল তাকাল। একটা পটকাও ফাটেনি। পতাকা ওড়েনি। উৎসব করতে আসা মানুষগুলো নিঃশব্দে বিবর্ণ অপমানিত মুখগুলোয় শ্মশানের বিষণ্ণতা নিয়ে মাঠ থেকে চলে যাচ্ছে। গ্যালারী ক্রমশ শূন্য হয়ে এল। বেদনায় মুচড়ে উঠল কমলের বুক। আর কখনো সে মাঠের মধ্যে থেকে ভরা-গ্যালারী দেখতে পাবে না। কমল গুহ আজ জীবনের শেষ খেলা খেলেছে।

কমল উঠে দাঁড়াল। কোনোদিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে সে মাঠের মাঝে সেণ্টার সার্কেলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আকাশের দিকে মুখ তুলল। অস্ফুটে বলল, "আমি যেন কখনো ব্যালান্স না হারাই। আমার ফুটবল যেন সারা জীবন আমাকে নিয়ে খেলা করে।"

কমল নিচু হয়ে মাটি তুলল। কপালে সেই মাটি লাগিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মত বলল, "অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছও। আজ আমি বরাবরের জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। জ্ঞানত তোমায় অসম্মান করিনি। নতুন নতুন ছেলেরা আসবে তোমাকে গৌরব দিতে। দয়া করে আমাকে একটু মনে রেখো।"

"কমলদা, চলুন এবার।" মাঠের বাইরে থেকে ভরত চেঁচিয়ে ডাকল। ওরা অপেক্ষা করছে তার জন্য।

মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় কমল দেখল, সেই সাংবাদিকটিকে খুব উত্তেজিত স্বরে কৃষ্ণ মাইতি বলছে, "আমিই তো কমলকে, বলতে গেলে, আবিষ্কার করি; ফুটবলের অ আ ক খ প্রথম শেখে আমার কাছেই।"

শুনে কমল হাসল। তারপরই চোখে পড়ল অমিতাভ দূরে দাঁড়িয়ে। কমল অবাক হল, বুকটা উৎকণ্ঠা আর প্রত্যাশায় দুলে উঠল।

এগিয়ে এসে প্রায় চুপিচুপিই বলল, "আজ জীবনের শেষ খেলা খেললাম, কেমন লাগল তোমার?"

অমিতাভ উত্তেজনায় থরথর স্বরে বলল, "তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছিল বাবা।"

"সত্যি!" কমলের বিস্ময় হাউইয়ের মত ফেটে পড়ল চোখেমুখে। তার মনে হল গ্যালারীগুলো আবার ভরে গেল।

"সত্যিই।"

"যদি আমার দশ বছর আগের খেলা তুই দেখতিস!" কমল হাসতে শুরু করল।